# পুষ্পাঞ্জলি

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

নারায়ণ লাইব্রেরী
২৭, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য পাঁচ সিকা

প্রকাশক—
শ্রীরাধারমণ বন্দ্যোপাধ্যায়
২৭, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রিণ্টার—
শ্রীমনীন্দ্রনাথ ভাণ্ডারী
ইন্দুনারায়ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
১৫, রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

# উৎসর্গ

পরমারাধ্যা

**স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর**

চরণোদ্দেশে

সেবকের

এই অকিঞ্চিৎকর

**পুষ্পাঞ্জলি**

অর্পিত

হইল

# নিবেদন

পুষ্পাঞ্জলি প্রকাশের কোন আশাই ছিল না, আমার সুহৃদ্ খ্যাতনামা গ্রন্থকার স্বর্গীয় নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য কনিষ্ঠ পুত্র আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ রাধারমণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগ্রহই ইহার প্রকাশের মূল। এই কার্য্যের জন্য আমি তাঁহার নিকট একান্ত বাধিত।

পাঠকগণ দেখিবেন, অর্দ্ধ শতাব্দী বা তৎপূর্ব্বের রচনাও ইহাতে আছে। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুকুমার বহুদিন পূর্ব্ব হইতে বহু স্থানে ঘুরিয়া এগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কলিকাতার সুবিখ্যাত "চৈতন্য লাইব্রেরি" হইতেই অনেকগুলির কিনারা হইয়াছে। তিনি যে দিনই গিয়াছেন, উক্ত লাইব্রেরির কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয়গণ অবাধে তাঁহাকে বহু পুরাতন মাসিক পত্র বাহির করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ অনুগ্রহের জন্য আমি তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে ঋণী এবং কৃতজ্ঞ।

মাসিক পত্রের মধ্যে সুবিখ্যাত "ভারতী" পত্রিকাতেই আমার কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন আমি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়িতাম—নিজের লেখার উপর নিজের বিশ্বাস ছিল না। এজন্য প্রথম কয়েকটি লেখা কবিবর (অধুনা বিশ্বকবি) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের নিকট পাঠাই। তিনি দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং উহাতে সংশোধনের কিছুই নাই এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া "ভারতী"র সম্পাদিকা মহাশয়ার নিকট পাঠাইয়া দেন। সম্পাদিকা মহাশয়াও ঐগুলি আনন্দের সহিত প্রকাশ করেন। এজন্য সম্পাদিকা মহাশয়ার নিকট, বিশেষতঃ

কবিবরের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী। সম্পাদিকা মহাশয়া এক্ষণে স্বর্গতা। কবিবরের নিকট আমি যে উৎসাহ পাইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

১২৯১ সালে সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে তদীয় জ্যেষ্ঠ জামাতা (অধুনা স্বর্গীয়) রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদকতায় মাসিক পত্র "প্রচার" বাহির হইলে দ্বিতীয় বর্ষ হইতে আমি তাহাতেও কবিতা লিখিতে থাকি। রাখাল বাবু আমার কবিতার বড়ই আদর করিতেন, ইহাতে আমি যথেষ্ট উৎসাহিত হই। এই উপলক্ষে পূজ্যপাদ সাহিত্য-সম্রাটের নিকট অনেক উপদেশ লাভ করিয়াও আমি কৃতার্থ হইয়াছিলাম। তাঁহারা উভয়েই এখন দিব্যধামে গত, সুতরাং তাঁহাদের নিকট সাক্ষাৎ-ভাবে এ ক্ষুদ্র হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া শান্তিলাভে বঞ্চিত হইতেছি।

সোমপ্রকাশ, নববিভাকর, এডুকেশন গেজেট প্রভৃতি সাপ্তাহিক পত্রেই আমি সর্ব্বপ্রথম কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি। এই সকল পত্রের সম্পাদক মহাশয়গণের অনুগ্রহ আমার চিরস্মরণীয়। সাপ্তাহিক পত্রগুলির কবিতা কিন্তু আমি কিছুই সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

পরিশেষে বক্তব্য, কয়েকটি কবিতার স্থলবিশেষ পরিবর্জ্জিত এবং কোন কোনটির কোন কোন স্থান কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অনেকগুলি লেখা অর্দ্ধ শতাব্দীর বা তাহারও পূর্ব্বের রচিত, এজন্য তাহাদের উৎপত্তির পরিচয় দিতে গিয়া, ভূমিকাটি "বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি" হইয়া দাঁড়াইল, পাঠক-পাঠিকাগণ সদাশয়তাগুণে মার্জ্জনা করিবেন।

কলিকাতা,
১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৪১

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

# সূচিপত্র

# পুষ্পাঞ্জলি

## বীণাধ্বনি

এসেছি কুহকে ভুলি
আকুল পরাণ মন,
গুঞ্জরে হেথা কি অলি,
হাসে কি কমল-বন !
হেথা কি সুনীল জলে
নীলাকাশ ভাসি' চলে,
উজল মুকুতা ফলে
রবি-করে অগণন—
গুঞ্জরে হেথা কি অলি,
হাসে কি কমল-বন !

হেথা কি বিরাজে চির-
মধু চির-মধুময়,
বাসিত সুবাসে ধীর
মলয় কি হেথা বয় ;
শ্বেত শতদল সরে
কাঁপে কি সমীর-ভরে,
মরাল-মরালী করে
তালে তালে সন্তরণ—
গুঞ্জরে হেথা কি অলি,
হাসে কি কমল-বন !

হেথা কি না ভাসে নর
কিন্নর নয়ন-পথে,
বীণা-রব ওঠে শুধু
দূর পদ্মবন হ'তে ;
জলে নভ-নীলিমায়
সে সুধা মিলা'য়ে যায়,
তীরে উপবন-ছায়
গেয়ে ওঠে পিকগণ-

গুঞ্জরে হেথা কি অলি,
হাসে কি কমল-বন !

এ কি সে বিজনে দিব্য
মানসের সরোবর,
তীরে কি সে উপবন
স্বপনের মনোহর ;
এ নিকুঞ্জে শুনি' গান
চিরধন্য হয় প্রাণ,
চিরতৃষা অবসান
পানে কি এ সুধা-ধন ?–
গুঞ্জরে হেথা কি অলি,
হাসে কি কমল-বন ?

জন্মভূমি—মাঘ, ১২৯

## বর্ষ-বিবর্ত্তন

আমি এসেছি আবার—
বাসনা গাহিয়ে গান স্বরসে জুড়া'তে প্রাণ,
শুনা'তে নূতন সমাচার—
এসেছি আবার!

আমি এসেছি আবার—
তরুরে ছেয়েছি ফল-মুকুলে,
ধরণী ঢেকেছি শ্যাম দুকূলে,
পরা'য়েছি লতিকায়
অঙ্গ বেড়ি' ফুল-অলঙ্কার—
এসেছি আবার!

রূপ-রস-গন্ধে ধরাতল
করিয়াছি আনন্দে চঞ্চল—
ভুঞ্জিতে মঞ্জুল ফুলে, গুঞ্জন-রত অলিকুলে
কুঞ্জে এনেছি ডেকে,
ওই শোন মধুর ঝঙ্কার—
এসেছি আবার!

আমি নীলিমা দিয়েছি ঢেলে আকাশে,
স্নুরভি দিয়েছি ঢেলে বাতাসে ;
নন্দন বনের পাখী যতনে এনেছি ডাকি'
থেকে থেকে কুহুতানে
মোহ আনে হৃদয়ে সবার—
এসেছি আবার !

জগৎ এ সাধনার
অবিচ্ছিন্ন স্নুখ হেথা নাই ;
আঁধার বিরাজে আগে পাছে,
তাতেই আলোক ফুটিয়াছে ;
তাই এ বিমল প্রাতে যতনে এনেছি সাথে
স্নুখ-মূল দুঃখ বিধাতার—
এসেছি আবার !

আমি এসেছি আবার—
জানি নে—গাহিয়ে গান স্নুরসে জুড়া'তে প্রাণ
অথবা শুনাতে হাহাকার—
এসেছি আবার !

প্রচার—বৈশাখ, ১২৯৫

# বঙ্গ-জননী

( প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষে লিখিত )

"বন্দে মাতরম্"—বঙ্গ-জননী আমার—
সুজলা সুফলা শস্যশ্যাম রূপ যাঁর।
দেবতাত্মা হিমালয় শিরে যাঁর শোভাময়,
পদতলে লোটে বঙ্গসাগর অপার,
সন্তানের শুভ তরে, সতত যাঁহার ক্ষরে
জাহ্নবী যমুনা দুই স্তনে ক্ষীরধার—
বন্দে মাতরম্—বঙ্গ-জননী আমার।

সুধন্য বৈষ্ণব কবি, শাক্ত শৈব আদি সবি
গেয়েছেন তব গান তোমারি ভাষায়,
শুনে সে ললিত গান আজিও জুড়ায় প্রাণ,
উচ্ছ্বসিয়া উঠে হৃদি অনন্ত আশায়।

তার পরে কত সুত, নিজ নিজ মনঃপূত
অলঙ্কারে সাজাইল শ্রীঅঙ্গ তোমার,
তাঁহাদের দিব্য দান মোহিছে সবার প্রাণ,
দেশে দেশে আজি তব সুষমা প্রচার!

দিব্যালোক-উপদিষ্ট কত ভক্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ
চারিদিকে প্রচারিল তব মহাবাণী,
কত সুত শক্তিমান্ রাখিতে তোমার মান
প্রাণাহুতি দিল দান নিজে ধন্য মানি'।

কৃষক শ্রমিক আর কত সুত শিল্পকার
হস্তজাত দ্রব্যে তব করিয়াছে পূজা,
তুষ্ট হয়ে বড় মনে, নিয়েছ তা সযতনে,
দশ হস্ত প্রসারিয়া তুমি দশভুজা।

আয়ু যশ ধন মান তাদের করেছ দান,
হে বরদায়িনী মাতা মোর বঙ্গভূমি,
সবারে করিয়া ধন্য, নিজ বক্ষ-সমুৎপন্ন
দেছ অন্ন অকাতরে অন্নপূর্ণা তুমি।

কত দিক্-দেশ হ'তে এসেছে সমুদ্র-পথে
কত জাতি কত কষ্ট করিয়া স্বীকার,
তারাও তোমার দান ল'য়ে বাঁচায়েছে প্রাণ,
ভুবন জুড়িয়া তব যশের প্রচার।

আজি মা অন্নের তরে, ছুটি দেশ-দেশান্তরে,
নিজ কর্ম্মদোষে, হায়, ভিখারীর মত,

তবুও ক্ষণেক তরে ভুলিতে পারি নে তোরে,
হৃদয়ের অন্তস্তলে জাগো মা সতত।

তোমার শ্যামল মাঠ, দীঘি সরোবর ঘাট,
তোমার সে সুশীতল বটতরু-ছায়,
কত জনমের মম আছে কি যে অনুপম,
সেইখানে ছুটে যেতে তাই মন চায়।

তোমার সে রবি শশী দেখি এখানেও বসি,
পরিচিত মধ্যে এরা—আর কিছু নাই,
হেথাও উদার-মন রয়েছেন বন্ধু-জন
শৈশবের সাথী কিন্তু খুঁজিয়া না পাই!

কি যে দুঃখ মোর চিতে, নাহি পারি প্রকাশিতে,
বুঝিবার শুধু ইহা—নহে বুঝাবার,
'বন্দে মাতরম্'—বঙ্গ-জননী আমার!

মাসিক বসুমতী—শ্রাবণ, ১৩৪১

# ধরাসুন্দরী

বল্, ধরাসুন্দরী, শুনি
কার প্রেমে তোর এত হাসি,
কার তরে সাজালি অঙ্গ
দিয়ে গুচ্ছ ফুলের রাশি।

সুন্দর 'বসন্ত বাসে'
তনুখানি আবরিলি,
মলয় মধুর শ্বাসে
গন্ধে ভুবন ভ'রে দিলি!

সোহাগেতে দুলে দুলে
সমীর-ভরে এলি ধেয়ে,
মধুর কাকলী ক'রে
পাখীর মুখে উঠ্‌লি গেয়ে!

নবপল্লব অধরে তোর
বাড়িয়ে দিলে শোভা অতি,
প্রভাত-কিরণ ঢেলে দিলে
মুখে তোর সুবর্ণজ্যোতি!

রূপ দেখে তোর মধু খেতে
প্রজাপতি এলো কত,
ফুলে ফুলে ঘোষণা তোর
দিয়ে গেলো মধুব্রত !
দেখে তোর কুন্তলের শোভা,
গেয়ে কোকিল অধীর হলো,
আকাশের চাঁদ নীরব রাতে,
মুখখানি চুমিতে এলো !

মনে পড়ে দুঃখে শোকে
বর্ষায় কত কেঁদেছিলি,
অবিশ্রান্ত নয়ন-জলে,
বুকখানি তোর ভাসিয়ে দিলি ?
এই ত দিনেক দুদিন আগে
ছিলি শীতে সঙ্কুচিত,
নিশির শিশির বুকে স'য়ে
হয়েছিলি অর্দ্ধমৃত !
আবার এমন সঞ্জীবনী
আচম্বিতে কোথায় পেলি,

অসাড় দেহ উঠলো জেগে,
গেয়ে ভুবন ভরিয়ে দিলি !
কে দিলে তোর আঁধার প্রাণে
ঢেলে এমন জোছ্না-রাশি ?—
বল্, ধরাসুন্দরী, শুনি
কার প্রেমে তোর এত হাসি !

ভারতী—বৈশাখ, ১২৯২

# নিরুদ্দেশের পথে

বালিকা গেল কোথা চলিয়া,
খেলিতে এসে খেলা ফেলিয়া !
খেলার ঘর-বাটী
সাজানো পরিপাটি
ভ'রেছে কুটি-মাটি পড়িয়া,
খেলানা ভাঁড় পড়ি
যেতেছে গড়াগড়ি,
ধূলার চিনি যায় উড়িয়া।
সেদিকে কেহ আর
চাহে না একবার,
চাহিলে আঁখি যায় ধাঁধিয়া,
পিপিড়া সারি দিয়ে
সেখানে শুধু গিয়ে
ফিরিয়া আসে বুঝি কাঁদিয়া !

প্রভাতে পাখী গায়—যেন বা ডাকে তারে,
আকাশে ওঠে চাঁদ—সে যেন খোঁজে কা'রে,

সাঁঝের তারা দুটি
ভাবিছে বুঝি উঠি'
আকাশ-পারাবার অকূলে,
কোথা সে গেল চ'লে—
'দেখেছি আগে' ব'লে
গণিত যে গো কচি আঙুলে।
নিখিল চরাচর
এখানে কেহ পর
ছিল না এতটুকু বুকে তার,
চোখেতে যখনি যা
পড়িত, তখনি তা
করিয়া নিত সে যে আপনার।

তাহারি চারাগাছে
মালতী ফুটিয়াছে,
সোহাগ যেন সে গো কার চায়,
লুঠিতে ফুল-বাস
পবন আসি শ্বাস
ফেলিয়া করে যেন হায় হায়!

পাখীটি খায়-দায়,
নহে সে সুখী তায়,
বিষাদে থাকে দাঁড়ে বসিয়া,
একটি বুলি আর
শুনি নে মুখে তার,
রেখেছে বুকে শোক পুষিয়া!
সে যে গো কোন্ পুরে,
গিয়াছে কত দূরে,
কাহারে কিছু নাহি বলিয়া,
সকলে তাই তারা
খুঁজিয়া হয় সারা
যেন গো স্নেহরসে গলিয়া!

এ যে গো ভাঙা ঘরে
বরষা-বারি ঝরে,
ঝটিকা বহে হু হু করিয়া,
গ্রাসিতে গৃহপাট,
ডুবায়ে পথ-ঘাট
গরজি' আসে যেন দরিয়া

ভুলিতে যত চাই, ভুলিতে নাহি পারি,
মনে যে নিশিদিন জাগে গো কথা তারি ;
সে কি মোদের কথা
ভাবিয়ে পায় ব্যথা,
যে গেছে এ হৃদয় দলিয়া—
বালিকা গেল কোথা চলিয়া !

প্রবাসী—কার্ত্তিক, ১৩৩৯

# বর্ষার মেঘ

নিদাঘ-পীড়িত তপ্ত বসুমতী
শীতল করিয়া সলিল-পাতে,
ফল-ফুল-শস্যে ভেটিতে ধরণী
বেড়াই আমরা পবন-পথে।

বহুদূরে থাকি, দূরদৃষ্টি রাখি,
সন্ সন্ করে' বহিয়া যাই ;
প্রতপ্ত প্রদেশ দেখিলে অমনি
হৃদয়ের ভারে থেমে দাঁড়াই।

নেমে গিয়ে তবে ধরণীর কাছে
ঝম্ ঝম্ করে' ঢেলে দি জল ;
আত্ম-দেহ-নাশ ?— তবু কত সুখ—
ধরণী তখনি হয় শীতল !

খর রবি-তাপে তরুলতাগুলি
ক্রমে ক্ষীণতর বিষাদময়—
ঢেলে দিলে শিরে ধারা সুশীতল,
ভিজিয়া ভিজিয়া প্রফুল্ল হয়।

বিষম উত্তাপ— গায়ের জ্বালায়
পশুপাখীগুলি কাতর-প্রাণ ;
গা বেয়ে পড়িলে নব-মেঘ-জল
শরীর কাঁপায়ে সমাধে স্নান।

আধ-ফোটা কলি হুতাশে শুকায় ;
ক্ষীণ লতিকায় বিষাদে কাটে,
বরষার জলে মিটা'য়ে পিপাসা
প্রাণ ভ'রে হেসে ফুটিয়া উঠে।

ফল-শস্য বিনা ধরা মরুময়—
কাতর ভুবন আকাশ চাই' ;
দেখিতে না পারি সে ভাব তাদের
অমনি গলিয়া পড়িয়া যাই।

ভালবাসি মোরা তরুলতাগুলি
আধেক ফুটন্ত কুসুমদল,
আকাশের পাখী, কাননের পশু—
সমানে সমগ্র ধরণীতল।

তাই সে তৃষিত বিশীর্ণ ব্যাকুল
যাইতে যাইতে দেখিলে কারে,
কাঁদি দুঃখে তার— সাধি আত্ম-নাশ—
ঢেলে দিই জল অজস্রধারে।

নিজ ক্ষয় সাধি— ক্ষতি কি তাহায়?
বিনাশে ত কারে করি না দুখী?
ভালবাসা মোরা চাহি না কাহারো,
ভালবেসে মোরা নিজেই সুখী!

পাক্ষিক সমালোচক—ভাদ্র, ১২৯১

# আশুতোষ

( নবম বার্ষিক স্মৃতিপূজা উপলক্ষে লিখিত )

বর্ষ পরে বর্ষ গত—আজি সেই দিন,
যে দিন ধ্বনিল তূর্য্য, বঙ্গের মানব-সূর্য্য
মহাদেব-মহাদেহে হইলা বিলীন !
বিনা মহাজ্যোতি তাঁর বঙ্গভূমি অন্ধকার,
সমগ্র ভারত অন্ধতমসে মলিন।

গঠিতে জ্যোতিষ্ক নিজ মহাজ্যোতি দিয়া,
যে মানব-সূর্য্য কায়-মন সমর্পিয়া
অনুদিন ছিলা রত, তাঁর সেই মহাব্রত
কে করিবে উদ্‌যাপন না পাই ভাবিয়া—
সে শক্তি, সে সাধনা কি আসিবে ফিরিয়া ?

কর্ম্ম—কর্ম্ম—শুধু কর্ম্ম—কর্ম্মের জীবন,
জাগ্রতে নিদ্রায় কর্ম্ম—কর্ম্মের স্বপন ;
সমগ্র এ পৃথিবীর মাঝে যত কর্ম্মবীর,
তাঁদেরি বরেণ্য তিনি ছিলা এক জন—
বাঙ্গালী হারালো তাঁরে বিধি-বিড়ম্বন।

সে যে গো ছিল না শুধু বিদ্বান্ ধীমান্—
আদর্শ-চরিত্র মর্ত্তভূমে মূর্ত্তিমান্ ;
কর্ত্তব্যের কঠোরতা, পরদুঃখ-কাতরতা,
সে দেহে অপূর্ব্বভাবে লভেছিল স্থান,
যেন সেথা দুই-ই মুখ্য, দুই-ই প্রধান।

ছিলা নিজে অনন্ত সে গুণের সাগর,
গুণ-গ্রহণেতে ছিলা তেমনি তৎপর ;
অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্রগুণ- আবিষ্কারে সুনিপুণ
হেন জন সুদুর্লভ সংসার-ভিতর—
আকর্ষিতে লৌহ যেন চুম্বক-প্রস্তর।

শত্রু-মিত্রে অভেদে করিতে ব্যবহার,
মনে দ্বিধা-বোধ কিছু ছিল না তাঁহার,
সত্য ন্যায় তাঁর কাছে, উচ্চ মান পাইয়াছে,
অন্যায়ের কাছে কিন্তু ব্যাঘ্র-অবতার,
'বাঙ্গালার বাঘ' খ্যাতি করে তা প্রচার।

পাশ্চাত্ত্য বিদ্যায় লভি অখণ্ড সম্মান,
বেছে নিয়েছিলা নিজে প্রাচ্যের যে দান ;
আচার-ব্যভার-বেশ, স্বদেশীর একশেষ,
স্বদেশীয় ভাষার উন্নতি তরে প্রাণ
কেঁদেছিল—করেছেন তাহারো বিধান।

নমি আজি সেই কর্ম্মিকুলের তিলক,
বিচার-আসনে সূক্ষ্ম ন্যায়-বিচারক ;
নবীনের অনুরক্ত, প্রবীণের প্রিয় ভক্ত,
নমি বঙ্গ-বিশ্ববিদ্যালয়-প্রসাধক,
স্বরাজের একনিষ্ঠ প্রচ্ছন্ন সাধক।

মাসিক বসুমতী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১

# মা

আকুল নয়ন-নীর
মুছে দাও ;
তাপিত পীড়িত হৃদি
আজি গো জুড়াব ব'লে
মা ব'লে এসেছি কাছে-
ফিরে চাও ,
আকুল নয়ন-নীর
মুছে দাও ।

জগতে আসিয়ে কেঁদে
চ'লে যাই,
মা ব'লে ডাকিলে নাহি
সাড়া পাই ।

সংসারে আনিয়া মোরে,
আপনি দাঁড়ায়ে স'রে,
দেখিতে কি খেলা, মা গো
তুমি চাও ;
আকুল নয়ন-নীর
মুছে দাও।

ভক্তি-বিহীন হীন
প্রাণ মন,
শক্তি-বিহীন ক্ষীণ
এ জীবন।
জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-হীন
করিয়া আমারে দীন,
জননী, তুমি কি মনে
সুখ পাও ;
আকুল নয়ন-নীর
মুছে দাও।

আমার এ প্রিয়তম
দেহ প্রাণ,
ধরায় করেছ মোরে
তুমি দান ;
জীবনের কাজ যাহা,
তুমিই করায়ে তাহা,
আবার স্নেহের কোলে
তুলে নাও ;
আকুল নয়ন-নীর
মুছে দাও।

প্রচার—আশ্বিন, ১২৯৫

# প্রকৃতি

অনাদি অনন্ত ব্যোম-বক্ষঃস্থলে
মহারাজ্য প্রকৃতির,
কোটি জড়পিণ্ড ক্রীড়াপর সেথা
ভীম বেগে অশনির।
এক সূত্রে বাঁধি কোটি গ্রহে ক্রীড়া
প্রকৃতির অনিবার,
নরের বিস্ময় বিপুলা ধরণী
নখাগ্রে বিরাজে তাঁর।

ইঙ্গিতে তাঁহার অনন্ত শরীরে
পৃথ্বী কোটি লীন হয়,
জন্মে কোটি পৃথ্বী ইচ্ছামাত্রে পুনঃ
অতুল সৌন্দর্য্যময়।

স্বজন-বিনাশে নির্ব্বিকার চিত্ত
নাহি সুখ-দুঃখ-স্রোত,
পূর্ণানন্দময় প্রাণে নিত্য তাঁর
সুখ দুঃখ ওত-প্রোত।

কোটি সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র-মণ্ডলে
রচিত আসন তাঁর,
প্রতি অণু-দেহে পূর্ণস্থিতি, তবু
সরূপে অরূপ সার !
স্বর্গ মর্ত্ত্য তাঁর স্নেহময় ক্রোড়,
জীবের মনোজ্ঞ বাস,
স্বর্গ মর্ত্ত্য তাঁর বদন-প্রসার-
বিনাশের কালগ্রাস।

এ হেন বিচিত্র ক্রীড়াময়ী যিনি,
মানবের ক্ষীণ মন,
না জানি কি মন্ত্রে, কি ভাবে পূজিবে
তাঁরে করি আবাহন।

কোন্ হৃদ্য স্তবে রসনা বর্ণিবে
অনন্ত মহিমা তাঁর,
সে অচিন্ত্য রূপ হবে প্রতিভাত
ধ্যানে কোন্ কল্পনার ?

ক্ষুদ্র ক্ষীণজ্যোতি দৃষ্টি ল'য়ে নর
করে বিশ্ব পরিমাণ,
শ্রবণ-যন্ত্রের স্থূল-শক্তি যোগে
শোনে সে বিশ্বের গান।
সীমাবদ্ধ জ্ঞান ত্রস্ত অনুক্ষণ
ভ্রম সংশয়েতে তার,
কি সাধ্য নরের হবে সে এ কূট
রহস্য-সমুদ্র পার !

নাহি জানে শিশু কি অনন্ত প্রেম
স্নেহময়ী মার বুকে,
বিস্ময়-বিমূঢ় শুধু চেয়ে রয়
অনিমেষ মার মুখে।

তেমনি আমরা— ব্রহ্মাণ্ডের জীব—
মা তোমার শিশু যত,
কি যেন কুহকে মা তোমার পানে
চেয়ে থাকি অবিরত।

ঘুচা মা প্রকৃতি, জড়তা নেত্রের,
হৃদয়ের মোহ-কূপ,
অসীম অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া
হেরি মা তোমার রূপ।
অনন্ত সৌন্দর্য্য- সাগরে মা তোর,
মিলাইয়া প্রাণ মম,
গাহি মহাযোগে— 'ব্রহ্মাণ্ড-স্বরূপা
ব্রহ্মময়ী নমোনমঃ।'

প্রকৃতি ( সাপ্তাহিক পত্র )

## লুকোচুরি

লুকোচুরি কেন এত আর,
চোখে চোখে সদা রাখি, তবু দিতে চাও ফাঁকি,
আমি কি বুঝি নে কিছু তার !

তুমি বটে ভাব মনে মনে,
মনোভাব রেখেছ গোপনে—
হৃদয় সে নিরজন, সেথা রম্য ফুলবন,
সন্ধান করিবে সাধ্য কার ?
কিন্তু সে তোমার ভুল, সেথা যে ফুটেছে ফুল,
প্রতি শ্বাসে আসে গন্ধ তার,
সেথা যে গাহিছে পিক, কানে বাজিতেছে ঠিক
দূরাগত সঙ্গীত সুধার !

অয়ি মুগ্ধে, অয়ি সঙ্কুচিতে,
পারিবে না আমারে ছলিতে ;
তোমার হৃদয়-মাঝে, যে সুর যখনি বাজে,
ঝঙ্কারে তা হৃদয়ে আমার ;
তবে যে বলি নে ফুটে', বিজয়ের-দীপ্তি টুটে,
পাছে কর মুখখানি ভার !

ভারতবর্ষ—কার্ত্তিক, ১৩২৩

# বাঁশী

জাগো জাগো, ব্রজবাসী,
বাঁশী বাজে ওই,
এমন মধুর ধ্বনি
শুনি নে ত কই !
কে বাজায় কোথা হ'তে,
বুঝি নে ত কোন মতে,
শুধু গো শ্রবণ-পথে
সুধা ঢালে, সই,
জাগো জাগো, ব্রজবাসী,
বাঁশী বাজে ওই !

নীরব নিঝুম নিশি,
নিশীথ গভীর,
জোছনা ঢালিয়ে দেছে
আলসে শরীর ।

এমন মধুর রেতে,
ওই শোন কান পেতে,
বাজিছে চরণে কার
মধুর মঞ্জীর,
সে ধ্বনি পবন বহে
ধীর—অতি ধীর।

বাঁশী শুনে ফোটে বনে
রাশি রাশি ফুল,
উছাসে যমুনা বয়
উছলিয়া কূল।
কুহরিয়া উঠে পিক,
শিহরিয়া উঠে দিক্,
স্থাবর জঙ্গম ঠিক
সমান আকুল,
কি জানি কি ভাবে প্রাণে
কিসে আনে ভুল!

আমার হিয়ার মাঝে
কেমনে কোথায়

কি কথা লুকানো ছিল
তাই বাঁশী গায়।
লুকানো তা ছিল কি যে,
জানি নে তা আমি নিজে,
কি মন্ত্রে কেমনে খুঁজে
বাঁশী তা শুনায় !
কে বাঁশী বাজায়, ও গো,
কে বাঁশী বাজায় !

সে কোন্ গহন বনে
ভুবন-মোহন,
বাজায় জানি নে, সখী,
বাঁশরী এমন।
তমালের তলে খুঁজি,
সেথা বঁধু আছে বুঝি,
খুঁজি কালিন্দীর কূলে—
নিষ্ফল যতন,
সে মোর পরাণ-বঁধু
না জানি কেমন !

আমি ব'লে নই, ও গো,
আমি ব'লে নই,
আপনা হারায় কে না
বাঁশী শুনে ওই।
জড়ের অধিক হেন,
তোমরা ঘুমায়ে কেন,
ওঠ ওঠ, প্রাণসখা,
ওঠ প্রাণ-সই—
জাগো জাগো, ব্রজবাসী,
বাঁশী বাজে ওই !

মাসিক বসুমতী—অগ্রহায়ণ, ১৩২৯

# অন্তিম আদেশ

( ধীবরের গৃহে ভগবান্ শাক্যসিংহের কথিত কাহিনী
অবলম্বনে লিখিত )

ছিল কাশীধামে ব্রহ্মদত্ত নামে
বড় রাজা একজন,
অতিশয় ক্রূর দারুণ নিষ্ঠুর
ঈর্ষ্যা-ক্রোধ-পরায়ণ।
তখন কোশলে, হীন অতি বলে
দীঘিতি নামেতে রাজা,
সন্তানের মত স্নেহে অবিরত
পালিতেন নিজ প্রজা।
ব্রহ্মদত্ত তাঁর রাজ্য ছারখার
করিল সবলে গিয়া,
বুঝিয়া গতিক, দীঘিতি সস্ত্রীক
বাঁচিলেন পলাইয়া।

কাশী-প্রান্তবাসী পরম বিশ্বাসী
ছিল এক কুম্ভকার,
তাহার আলয় করিল আশ্রয়,
তার বৃত্তি করি সার।
কিছুদিন পর সেখানে সুন্দর
পুত্র প্রসবিল রাণী,
খাটিয়া দুজন করে উপার্জ্জন,
দিন যাপে তিন প্রাণী।
আনন্দে গলিয়া, দীঘাভূ বলিয়া
ছেলেটিকে তারা ডাকে,
রাজ্য হারাইয়া, তাহাকেই নিয়া,
পূর্ব্বকথা ভুলি' থাকে।
বছরের পর কতই বছর
এইরূপে হলো পার,
একদা নিষ্ঠুর ব্রহ্মদত্ত ক্রূর
সন্ধান পাইল তাঁর।
বিলম্ব নিমেষ না করি', আদেশ
দিল অনুচরগণে,
ত্বরা করি গিয়া আনিতে বাঁধিয়া
রাজা রাণী দুইজনে।

তাদের ধরিতে চলিল ত্বরিতে
রাজ-সেনা বহুজন,
মশক মারিতে কুমার-বাড়ীতে
কামানের আয়োজন !
কুম্ভকার-গৃহ হইতে নিরীহ
রাজা ও রাণীরে টানি'
ক্রূর নৃপতির সম্মুখে হাজির
করিল তাহারা আনি'।
ব্রহ্মদত্ত ভূপ বিচার-বিদ্রূপ
করিল আদেশ দান,
"এই দণ্ডে নিয়া বধ্য ভূমে গিয়া
বধ' এ দুটার প্রাণ।"
আজ্ঞামাত্রে তাঁর যম-দূতাকার
অনুচর অগণিত,
বেড়িয়া দুজনে করিল সে ক্ষণে
বধ্যভূমে উপনীত।

পিতা ও মাতায় ধ'রে ল'য়ে যায়
যখন রাজানুচরে,

কোন সমাচার জানিত না তার—
দীঘাভূ ছিল না ঘরে।
গ্রাম-মাঝে ঢুকে শুনি' লোকমুখে
এই নিদারুণ কথা,
রুদ্ধশ্বাসে, হায় বধ্যভূমে ধায়,
যথা তার পিতা মাতা।
শান্ত অচঞ্চল বদন-মণ্ডল
পিতার দেখিল গিয়া,
মধুর ভাষায় পিতা কহে তায়,
উদ্দেশে আশিস্ দিয়া—
"মোর বলিবার কিছু নাহি আর,
মাত্র শেষ অনুরোধ—
বৎস দীঘাভূ, লইও না কভু,
হিংসায় হিংসার শোধ।"

এ কথা শুনিয়া বন-মধ্যে গিয়া
দীঘাভূ কাঁদিল কত,
বনের মাঝার কয় দিন তার
এইরূপে হ'ল গত।

কয় দিন পরে ফিরিয়া নগরে,
রাজ-হস্তিশালে গিয়া,
মাহুতেরে তুষি' হল বড় খুসি
তারি কাছে কাজ নিয়া।
একদিন ভোরে আধ-ঘুম-ঘোরে
যখন নগরবাসী,
দীঘাভূ তখন মানস-মোহন
বাজায় আপন বাঁশী।
অতি সুমধুর সে বাঁশীর সুর
পশিল রাজার কানে,
কহিয়া সেবকে বংশী-বাদকে
কাছে ডাকাইয়া আনে।
তুষ্ট নরপতি হ'য়ে তার প্রতি
কহিলেন তারে পাছে,
"শরীর-রক্ষক আমার সেবক
হ'য়ে থাকো মোর কাছে।"
রহিল দীঘাভূ— কাজে তার কভু
তিল ত্রুটি নাহি হয়,
নানা গুণে তার ক্রমশ রাজার
হৃদয় করিল জয়।

একদিন রাজা শিকারেতে যা' যা'
আবশ্যক, সব নিয়ে,
সঙ্গী সেনা সনে চলিলেন বনে,
রথে বসি' বার দিয়ে।
দিলা নরপতি দীঘাভূর প্রতি
রথ-চালনের ভার,
বেগে তীরবৎ চালাইল রথ,
দীঘাভূ আদেশে তাঁর।
সঙ্গী সেনা হতে গিয়া ভিন্ন পথে
পশিল নিবিড় বনে,
কে বুঝিবে আর অভিসন্ধি তার
ছিল কি যে মনে মনে।
বেলা দ্বিপ্রহর নৃপতি কাতর
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অতি,
হয়ে নিদ্রাতুর অঙ্কে দীঘাভূর
মাথা রাখে শীঘ্রগতি।
কিছুক্ষণ পরে ঘোর নিদ্রাভরে
ব্রহ্মদত্ত অচেতন,
দীঘাভূর আঁখি যেন রক্ত মাখি'
প্রকাশিল সেইক্ষণ—

"এই দুরাচার বধে'ছে আমার
পিতা মাতা হিতকামী,
উষ্ণ রক্তে এর তর্পণ তাঁদের
করিব আজিকে আমি।"
কোষ-মুক্ত অসি উঠিল ঝলসি'
মুষ্টিবদ্ধ করি' তায়,
ভূপতির বক্ষ করি' স্থির লক্ষ্য
বিদীর্ণ করিতে যায়,
সহসা সে ক্ষণে প'ড়ে গেল মনে
শেষ পিতৃ-অনুরোধ—
"বৎস দীর্ঘাভূ, লইও না কভু
হিংসায় হিংসার শোধ।"
হস্তে অসি স্থির, বদন গম্ভীর,
সহসা গেল সে থামি'—
মিটাইতে ক্রোধ, শেষ অনুরোধ
লঙ্ঘিব পিতার আমি!

এখন সময় রাজা জাগি' কয়
স্বপ্ন দেখি' ঘুম-ঘোরে,

"যায়—প্রাণ যায়, না দেখি উপায়,
দীধাভূ, বাঁচাও মোরে!"
কহিল দীঘাভূ— "ভয় নাই, প্রভু,
রাখিয়াছি তব প্রাণ,
পিতার আদেশ মনে পড়ি' শেষ
হইয়াছি সাবধান।"

পরে সমুদয় নিজ পরিচয়
দীঘাভূ রাজারে বলে,
অন্তিম আদেশ পিতার বিশেষ
কহিল নয়ন-জলে।
ক্রূর ভূপতির চক্ষু হ'ল স্থির
জানি না সহসা কেন,
হৃদয় পাষাণ, কর্দ্দম সমান
গলিয়া কোমল যেন!
কহে ক্রূর-রাজ— "জীবনের কাজ,
নাহি বুঝিয়াছি আগে,
বুঝিলাম শুনি' সাধুর কাহিনী,
জীবনের শেষ-ভাগে।

যাইতেছে জ্বলে'　　　　অনুতাপানলে
এ মোর কঠিন হিয়া,
সাধু, সাধু-সুত,　　　　যাও যাও দ্রুত,
পিতৃরাজ্য লহ গিয়া।"

মাসিক বসুমতী—ভাদ্র, ১৩৪১

## সংসার-সঙ্গিনী

দাঁড়াও আলোকময়ী,
এ ঘোর সংসার-পথে—
এ ঘোর নিশীথে আমি
পথ-হারা বন-ভূমে,
শ্রান্ত ক্লান্ত পা দু'খানি
বন-ভূমি চুমে চুমে,
অবসন্ন দেহ প্রাণ
চাহিছে বিরাম-স্থান,
কাতরে বহিছে বারি
নিদ্রাতুর আঁখি হ'তে—
দাড়াও সংসার পথে !

দাঁড়াও আনন্দময়ী,
এ ঘোর সংসার-পথে—
হেথা যে দুর্ব্বল প্রাণে
আশার নিরাশ-খেলা,

প্রাণের আনন্দ নাশে
সারা-নিশি সারা-বেলা ;
পেয়ে ও আনন্দ-ধারা
হাসে চন্দ্র, ফুটে তারা,
ঢাল সে আনন্দ-সুধা
নিরাশ শরণাগতে—
দাঁড়াও সংসার-পথে !

দাঁড়াও করুণাময়ী,
এ ঘোর সংসার-পথে—
করুণার তরে আমি
আকুল জগত ঘুরে,
এখানে পেয়েছি দেখা
জগতের অতি দূরে,
বিশদ করুণা-রেখা
যেন ও ললাটে লেখা,
যেন ও হৃদয় মগ্ন
জগতের মহাব্রতে—
দাঁড়াও সংসার-পথে !

দাঁড়াও মঙ্গলময়ী,
এ ঘোর সংসার-পথে—
জগতের কার্য্য যত
তোমার করুণা লভি',
আশা হয় মনে যেন
সাধিতে পারিব সবি ;
এ বিশ্বে ঢালিতে প্রীতি,
প্রীতিরাশি মূর্ত্তিমতী,
তোমারে এ কোন্ বিধি
মিলাইল কোথা হ'তে—
এ ঘোর সংসার-পথে !

প্রচার—আষাঢ়, ১২৯৫

# ফুলের খেলা

সে কোন্ ফুলের খেলা ফুলের বনে,
কি স্বপনে দেখেছিনু, জাগে তা মনে।
সেই একদিন হায়, মধু-নিশি যায় যায়,
ঢল ঢল জোছনায় সুখ-শয়নে,
নদী-কূলে ছিনু শুয়ে কুসুম-বনে।
রজত-মল্লিকা পাশে, ঘুমায়ে ঘুমায়ে হাসে,
ধীরে বায়ু যায় আসে প্রমোদ-ভরে,
জোছনা-মাখান জল, ব'য়ে যায় কল কল,
পিক-বধূ ঢালে মধু শ্রুতি-কুহরে।
না জানি কি মোহ মাখি' মুদিয়া আসিল আঁখি,
কি দেখিনু, চমকিনু—কে এ বুঝি না,
কুসুম-কোমল করে মধুর বিলাস-ভরে
বাজাইয়া গেল মোর হৃদয়-বীণা।

নয়ন মেলিয়া চাই, আর না দেখিতে পাই,
জোছনায় নাই—নাই কুসুম-বনে,
কোথায় খুঁজিব চোর, হয় নাই নিশি-ভোর,
তখনো যে ঘুম-ঘোর ছিল নয়নে !

প্রতিভা—

## গাঁথা মালা

সই রে জ্বলিনু মিছে,
বাসনা হইল সার !
সারা বন বুলে বুলে,
বন-ফুল তুলে তুলে,
গাঁথিনু চিকণ মালা—
দিব কারে উপহার ?-
সই রে জ্বলিনু মিছে,
বাসনা হইল সার !

হৃদয়ে বাসনা ভ'রে
গাঁথিলাম যার তরে,
সে কোথা চলিয়ে গেছে
জানি নে ত কিছু তার ;
কেন তবে গেঁথে মালা
মিছে বাড়াইনু জ্বালা,

হৃদয় ডুবায়ে দিনু
শোক-হ্রদে নিরাশার
সই রে জ্বলিনু মিছে,
বাসনা হইল সার !

আগে ত জানি নে মালা
গাঁথিলে কাঁদিতে হবে,
কাঁদিতে সাধনা ক'রে
কে মালা গাঁথিত তবে ?
এত আশা ল'য়ে মনে,
কে আসিত ফুল-বনে,
লতিকারে ব্যথা দিতে
কে হরিত ফুল তার ?—
সই রে জ্বলিনু মিছে,
বাসনা হইল সার !

গেয়ে এসেছিল অলি
চুমিতে কুসুম-কলি,

ফিরে তারা চ'লে গেল
ক'রে সবে হাহাকার,
তরু-তলে ফেলে গেল
বিরলে নয়নাসার !
আমি যেন তাই নিয়ে,
মালা গেঁথে তাই দিয়ে,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছি
আশা-পথ চেয়ে তার,—
সই রে জ্বলিনু মিছে,
বাসনা হইল সার !

অতি অবশেষ নিশি,
শেফালি পড়িছে খসি',
উষারে জাগাতে আসি
ডাকে বায়ু বারেবার ;
আলসে আকাশ-গায়
ম্লান চাঁদ ডুবে যায়,
তারা-মালা পড়ে খ'সে—
যামিনীর গাঁথা হার !

আমি শুধু সারা নিশি
প্রহর গণিনু বসি',
ফুল-দল পড়ে খসি',
ফুরায় সুরভি তার,-
সই রে জ্বলিনু মিছে
বাসনা হইল সার !

প্রাণের মাঝারে আজি
উথলে যমুনা-জল,
কি দিয়ে কেমনে সখী
রোধিব তাহারে বল্ !
জীবন সে কোন্ পুরে,
আলয় খুঁজিছে দূরে,
হৃদয় যে ভেঙেচূরে
হয়ে গেল একাকার,—
সই রে জ্বলিনু মিছে,
বাসনা হইল সার !

প্রচার—বৈশাখ, ১২৯৪

## অমর-সঙ্গীত

এলাহাবাদে জাতীয় মহাসমিতির চতুর্থ অধিবেশন উপলক্ষে লিখিত।

এখনো কে আছ অবসন্ন-প্রাণ,
উঠ, জাগ—শোন ভারত-সন্তান,
মর্ত্ত্যভূমে আজি কি অমর-গান
অনন্ত উচ্ছ্বাসে বহিয়া যায়;
দেখহ চাহিয়া কি বা অনুরাগে,
কি সিদ্ধি লভিতে, কোন্ মহাযাগে,
শত শত ভক্ত মিলিয়া প্রয়াগে
প্রমত্ত আজি এ মহাপূজায়!

ভেদিয়া নিবিড় অভেদ্য আঁধার,
অনন্ত আকাশে যেন পূর্ব্বাশার
ভাতিবে কি রবি তেজঃপুঞ্জাকার
সমগ্র ভারতে কাঁপিছে গান;

শত শত ভক্ত বৈষম্য ভুলিয়া,
অপূর্ব্ব বিস্ময় পুলকে পূরিয়া,
প্রতীক্ষায় তাই আছে দাঁড়াইয়া
সে পদে কি অর্ঘ্য করিবে দান

বুঝি সে আলোকে ঘুচাতে বিষাদ,
স্বর্গ হ'তে ক্ষরি' আসে আশীর্ব্বাদ,
সমগ্র ভারতে ছুটিছে সংবাদ,
চরাচর সুখী হইবে তায়—
এখনো কে আছ অবসন্ন-প্রাণ,
উঠ, জাগ—শোন ভারত-সন্তান,
মর্ত্ত্যভূমে আজি কি অমর-গান
অনন্ত উচ্ছ্বাসে বহিয়া যায়।

ব্যাপিয়া অনাদি অনন্ত সময়,
দেখ কত জাতি এই বিশ্বময়,
এ শুভ মুহূর্ত্ত করিয়া আশ্রয়
জাগিল—গাহিল অমর-গান ;

দিব্য মুখজ্যোতি অমনি হেরিয়া,
কোটি কোটি প্রাণী বিস্ময়ে পূরিয়া,
সসম্ভ্রমে সবে চাহিল ফিরিয়া—
দেখিয়া হইল মোহিত-প্রাণ।

অতুলিত স্নেহ প্রকাশি' জননী—
ফল-ফুল-শস্যে শোভিত ধরণী—
ল'য়ে সুতচয়ে বুকেতে আপনি
হাসিল —জগৎ আনন্দময়;
দিব্যালোক ব্যাপ্ত হইল এ ভুবি,
দীপ্ত গ্রহ গেল সে আলোকে ডুবি',
ভূতলে ধ্বনিল অমর-দুন্দুভি,
ভূলোকে ঘোষিল দ্যুলোক-জয়।

বসুধা-বিখ্যাত বৃটনের বরে,
আসে কি সে দিন ভারত-ভিতরে,
শত শত ভক্ত তাই যোড়করে
দাঁড়াইয়া সবে রোমাঞ্চ-কায়—

এখনো কে আছ অবসন্ন-প্রাণ,
উঠ, জাগ—শোন ভারত-সন্তান,
মর্ত্ত্যভূমে আজি কি অমর-গান
অনন্ত উচ্ছ্বাসে বহিয়া যায় !

এস এস ভাই হিন্দু মুসলমান,
এস বৌদ্ধ জৈন পারসী খৃষ্টান,
এ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে করি' গাত্রোত্থান
বন্ধুভাবে মিলি' সবে দাঁড়াই ;
এ প্রাণ পূরিয়া অপূর্ব্ব আশায়,
করি স্তুতিগান অমর-ভাষায়,
তমঃপুঞ্জ ভেদি' যদি এ ঊষায়
সে রবি উদয় দেখিতে পাই !

অষ্টাবিংশ কোটি কণ্ঠে তুলি' লয়
গাহিতে পারিলে জননীর জয়,
জাগে কি জীবনে মরণের ভয়—
অসার সংসার-ভাবনা ছার—

মহাযজ্ঞ মাতৃ-ক্লেশ-বিমোচন,
মাতৃপূজা কোটি কোটি দেবার্চ্চন,
ইহ-পর-লোকে কি আছে তেমন
  বাঞ্ছিত নরের বল না আর ?

এস, ডাকি তাই পারসী খৃষ্টান,
এস বৌদ্ধ জৈন হিন্দু মুসলমান,
ভুলি' জাতিগত দ্বেষা অভিমান
  এ মহা-উৎসবে ডুবিয়া যাই :
একই দেশমাতৃ-গর্ভে জনমিয়া,
রাজ-কুল-রাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া-
একচ্ছত্র রাজ্যে শাসিত হইয়া,
  একত্র কেন না হইব ভাই ?

শুভক্ষণে দেখি সুমঙ্গলময়
আজি এ ভারতে মহা অভিনয়,
প্রফুল্ল-বদনে বলি' জয় জয়
  জাগ নারী-নর পুলক-প্রাণ ;

রাখি' পূর্ণ কুম্ভ, রচি' আম্রসার
সুশোভিত কর গৃহ গৃহদ্বার,
প্রীতি-নীরে ধুয়ে কর পুনর্ব্বার
পবিত্র মাতার পূজার স্থান।

অষ্টাবিংশ কোটি কণ্ঠে তুলি' লয়,
এস সবে গাহি জননীর জয়,
জীবনে না রবে মরণের ভয়,
অসার সংসার-ভাবনা ছার—
মহাযজ্ঞ মাতৃ-ক্লেশ-বিমোচন,
মাতৃপূজা কোটি কোটি দেবার্চ্চন,
ইহ-পর-লোকে কি আছে তেমন
বাঞ্ছিত নরের বল না আর?

গাঢ় তমঃপুঞ্জ-সমাচ্ছন্ন দিশি,
কাটিয়াছে বহু সুপ্ত ঘোর নিশি,
আঁধারের সাথে গিয়াছিল মিশি'
প্রাণের সাধনা কামনা বল;

পূরবে নিরখি কনক-কিরণ,
জাগিয়া আবার আজি কত জন,
মেলিয়া নবীন প্রফুল্ল নয়ন
হেরিছে সমগ্র ধরণী-তল।

বসুধা-বিখ্যাত বৃটনের বরে
আসিছে সুদিন ভারত-ভিতরে,
দাঁড়াইয়া আজি তাই যোড় করে
দেখ কত ভক্ত রোমাঞ্চ-কায় ;—
এখনো কে আছ অবসন্ন-প্রাণ,
উঠ, জাগ—শোন ভারত-সন্তান,
মর্ত্যভূমে আজি কি অমর-গান
অনন্ত উচ্ছ্বাসে বহিয়া যায়!

প্রচার—অগ্রহায়ণ, ১২৯৫

# অমানুষের প্রতি

শুধু খেয়ে খেলে হেসে অবহেলে
দিন কেটে গেলে হয়—
এ নয়, এ নয় মানুষের কথা—
কখনই এ তো নয়।
তাই যদি হবে পশু ও মানবে
প্রভেদ কোথায় তবে ?
কি কাজ ভবনে ?— যাও চ'লে বনে,
পশুদের সাথে র'বে।
ঈশ্বরের দান আত্মা সুমহান,
বিবেক বিগ্রহ তায়,
জ্ঞান ভক্তি প্রেম, যা কিছু সকলি
টেনে ফেল দরিয়ায়।
মানুষের ভাষা কলঙ্কিত আর
করিও না কথা ক'য়ে,
যাও, বনে যাও— কর গে চীৎকার,
বনচর পশু হ'য়ে।

মনুষ্য-জীবন দুর্লভ রতন,
হেলার সামগ্রী নয়।
সাজে না ইহাতে শুধু বাজে কাজে
সময়ের অপচয়।
জ্ঞানের সমুদ্র বিরাজে সম্মুখে—
রত্ন কর আহরণ,
চেয়ে দেখ ওই কাঁদে চারিদিকে
কত দীন দুঃখী জন।
ক্ষুদ্র নহ তুমি, তুমি শক্তিমান্,
ঘুচাও তাদের দুখ,
বুঝিবে তা হ'লে, আছে যে কোথায়
জীবনে প্রকৃত সুখ।
নরদেহ ধরি' জন্মিয়াছ যদি,
ধ'রো না পশুর বেশ,
মানুষ হ'য়েই করে যাও তুমি
মানুষের কাজ শেষ।

## ফুলের হাসি

আঁধারে আজি ফুল ফুটিলি কেন বল্,
কি সুখ প্রাণে তোর লুকায়ে পরিমল!
তোর এ রূপরাশি, তোর এ সুধা-হাসি
আঁধারে মিশাইয়ে লভিলি কোন্ ফল—
আঁধারে আজি ফুল ফুটিলি কেন বল্!

তুই ফুটিবি ব'লে প্রবাসে যেতে যেতে,
সাঁঝের রবি-খানি আপনি আড়ি পেতে,
মেঘের আড়ে থেকে চাহিল তোর পানে,
চাহিল কত বার লোহিত দুনয়ানে;
সোনার কর দিয়ে অতুল সুষমায়
সাজালে কভু সাধে আপনি তোর কায়,
বিষাদে কত বার করিয়ে কত ভাণ,
গাছের আড়ে গিয়ে জানালে অভিমান;

তুষিতে তার প্রাণ   তবু ত উঠিলি না—
কই রে, ফুলবালা,   তুই ত ফুটিলি না!
চুমিতে পরিমল   আকুল অলিদল
কত না আশা ক'রে এখানে এসেছিল,
পাখীরা নেচে নেচে,   পাখীরা গেয়ে গেয়ে,
ঘুরিয়ে তোর পাশে সকলে ফিরে গেল।
নদীতে ছুটে ছুটে   আকুল ঢেউগুলি,
ধরিতে হাসি তোর   আসিল মুখ তুলি'।
চাহিয়ে তোর পানে   কত না আশা ক'রে,
হতাশে চ'লে গেল   মিশিতে পারাবারে।
কাতর সে সবারে   ভাল ত বাসিলি না,
কই রে, ফুলবালা,   তুই ত হাসিলি না!

তিমিরে বসুমতী   হইলে নিমগন,
শীতল জলকণা   বহিয়া সমীরণ,
নিসাড়ে নিরিবিলি   আসিয়া গুটি গুটি,
মুছায়ে দিল তোর   অলস আঁখি দুটি;
অমনি ধীরে ধীরে   দেখিলি তুই চেয়ে,
ঝরিল সুধা-হাসি   অধর তোর বেয়ে।

খেলিলি বায়ু সনে সরমে ফিরে ঘূরে,
কখনো কাছে তার, কখনো গিয়ে দূরে ;
শ্যামল কিসলয় তোর সে কেশ-ভার,
লুকালি তার মাঝে মু'খানি কত বার।
হাসিয়া সমীরণ আসিয়া পুন দুলে,
সোহাগে চুমি' তবে ঘোমটা দিলে খুলে
অমনি হেসে তুই হইলি ঢল্ ঢল্—
আঁধারে আজি ফুল, ফুটিলি কেন বল্!

প্রচার—আষাঢ়, ১২৯৩

# মহাভিক্ষা

অনন্ত কালের স্রোতে
ভেসে যায় দিবা রাত্রি,
চ'লে যায় আলো অন্ধকার,
না জানি নীরবে কোথা
গঠিছে অনন্ত কাল
আলোক-আঁধার-পারাবার।
না জানি নীরবে টুটি'
অনন্তে মিশিছে কোথা
কোটি কোটি জীবের বাসনা,
না জানি লভিছে কোথা
বিজনে বিশ্রাম-সুখ
পথশ্রান্ত প্রাণের যাতনা।
অনন্তে অসীমে শুয়ে,
গভীর বিজন-মাঝে
জগতের নেত্রজল দিয়ে,

না জানি খেলিছে কোথা,
স্বপনে নিদ্রিত কাল
রোদন-সমুদ্র বিরচিয়ে

এ আমি অসীম মাঝে
ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতম অতি—
পবনের পরমাণু প্রায়,
না জানি কিসের তরে
প্রাণে মহাভিক্ষা ল'য়ে
ছুটিয়াছি জাগ্রতে নিদ্রায়।
পুঞ্জ পরমাণুময়
বিশাল বিশ্বের এই
প্রতি অণু-পরমাণু-কাছে,
প্রতিদিন—প্রতিক্ষণ,
স্বপ্নময়—মোহময়
কি ভিক্ষা আমার যেন আছে।
কে যেন গঠিছে নিত্য
তাহাদের সাথে মোর
সংযোগের অচ্ছেদ্য বন্ধন,

এ আত্মা চাহিছে তাই
আগ্রহে সে সকলের
প্রতি আত্মা করিতে চুম্বন।
তারাও আসিয়া তাই
জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে
প্রাণে মোর যেতেছে মিশিয়া,
অনুদিন অনুক্ষণ—
তিলেক বিশ্রাম নাই,
ব্যস্ত আছে আমারেই নিয়া।
জানি না ত আমি কিছু—
আমার এ মহাভিক্ষা,
তাহাদের এই মহাদান,
অনন্ত কালের পুনঃ
অঙ্গুলি-সঙ্কেতে কবে
চিরতরে হবে অবসান।

ভারতী—ভাদ্র, ১২৯৪

# নববর্ষ

আকাশ-তলে সাগর-জলে,
　　পেতে বিশাল রঙ্গভূমি,
নেচে নেচে গেয়ে গেয়ে
　　দিচ্চ দেখা কে আজ তুমি ?
ভবিষ্যতের অন্ধকারে
　　তোমার সকল অঙ্গ ঢাকা,
আশার চোখে দেখ্‌চি কেবল
　　মুখখানি ও হাসিমাখা।
আস্‌চ ব'লে তুমিই কি হে
　　নব-দূর্ব্বাদলে মিলে,
মাঠে ঘাটে হরিদ্বর্ণ
　　আসনগুলো বিছিয়ে দিলে ?-
গুল্ম-তরু-লতা গুলো
　　বনের মাঝে সাজিয়ে মঠ,
চার দিকেতে খুলে দিলে
　　নানা রঙের দৃশ্যপট ?

ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো
চেনা চেনা পাখীগুলি,
অভিবাদন করতে কি তাই
নিয়ে কিচির-মিচির বুলি ?

এস এস, নববর্ষ,
সবাই সুখী তোমায় দেখে,
হাসিমাখা মুখটি কিন্তু
ঐ খানেতে এস রেখে।
একটু আগে, যার সনে এই
কোলাকুলি করলে সুখে,
এসেছিল সেও অবিকল
তোমার মত হাস্যমুখে।
রঙ্গ কত করবে ব'লে
লোভ দেখালে শত শত,
প্রকৃতি তার এগিয়ে এসে
দৃশ্যপট ঐ খুললে কত।
গান শোনাতে অলি এলো,
রূপ দেখাতে ফুল-বালা,

লতা এলো ঘোমটা টেনে
  মাথায় ফুলের বরণ-ডালা।
এই রকমে চোর সে চতুর
  সঙ্গে নে তার সঙ্গী ক'টা,
জুটেপুটে লাগিয়েছিল
  অভিনয়ের বড্ড ঘটা।
গেল যখন, দেখি তখন
  হিসেব ক'রে কি ছাই চুলো,
অভিনয় সে ক'রে গেছে
  বিয়োগান্ত নাটকগুলো।
হাতে মাথা রাখ্‌তে দেখি
  চক্ষু যেন হয়ে ফুটো,
তপ্ত জলের ধারা ব'য়ে
  ভিজে গেছে গণ্ড দুটো।
মাথায় আবার ছোট বড়
  একশো আগুন জ্বেলে দেছে,
বুকের মাঝে হাত দে দেখি,
  কি-যেন-কি হারিয়ে গেছে!
আরেকটা কাজ এই করেছে
  দেখিয়ে সে তার বাহাদুরি,

তলে তলে করে গেছে,
একটা বছর আয়ু চুরি !

ও-ই বলে নয় একটা শুধু,
অমনতর এলো কত,
কালের গায়ে আঁচড় রেখে
পালিয়ে গেলো চোরের মত।
আশায় ম'জে মুখ চেয়েছি,
জানি নে যে চিনির ছুরি,
একশো চোখের মাঝখানেতে
প্রাণের ঘরে করলে চুরি।
তাই বলি, তুই লোভ দেখিয়ে
আর কেন ভাই জ্বালাস্ মিছে,
আজ্‌ও আমার জ্বল্‌চে পরাণ,
কাম্‌ড়ে গেছে কালের বিছে !
তুইও যত করবি ভাল,
জানতে আমার নেইকো বাকি,
নূতন বছর শুনতেই বেশ,
ভিতরেতে সবই ফাঁকি !

ভারতী—বৈশাখ, ১২৯৩

# অশ্রুবিন্দু-উপহার

দয়াময়, কোথা তুমি, কোথা তুমি, এস-না হে,
পরিশ্রান্ত বড় আজি দাঁড়াতে পারি নে আর,
তোমারি আদেশে, নাথ, সংসার ভ্রমিতে গিয়ে,
এনেছি তোমার তরে অশ্রুবিন্দু উপহার।
নানা খেলা পেয়ে সেথা, তোমারে ভুলিয়ে গিয়ে,
কত যে পেয়েছি জ্বালা, কি কব হে—কি কব হে ;
এ ক্ষুদ্র হৃদয় মম, যাতনা অনন্তোপম,
বল নাথ—বল নাথ, কত সহে— কত সহে !
দিশাহারা হয়ে আমি কত দিকে চেয়েছি যে,
কাতরে, আকুল প্রাণে কেঁদেছি যে কত বার,
দেখিতে কি পেয়েছি হে— দেখা কি দিয়েছ, নাথ—
দশ দিকে দেখেছি যে অন্ধকার—অন্ধকার !
কত মরু মরীচিকা পেয়েছি জীবন-পথে,
কব কি তোমারে আমি—না জান কি তুমি তার—

তোমার রাজত্বে ঘুরে, নিরবধি পেয়েছি যা,
এনেছি তোমার তরে অশ্রুবিন্দু উপহার !

পাপী যে তাপী যে আমি, বড় জ্বালা সয়েছি যে,
তাপিত্ত ব্যথিত হৃদে দিওনাক ব্যথা আর,
দয়ার ভিখারী আজি, দুয়ারে দাঁড়ায়ে তব,
দয়াময়, দাও এসে নামাইয়ে দুখ-ভার।
দিয়েছিলে যত কিছু, সব ফেলে এসেছি হে,
পারি নে আনিতে হেথা বিন্দুমাত্র আমি তার,
তোমারি আদেশে, নাথ, সংসার ভ্রমিতে গিয়ে,
এনেছি তোমার তরে অশ্রুবিন্দু উপহার !

ভারতী—আষাঢ়, ১২৯৩

## প্রভাতে

দেখ কে দাঁড়ায়ে হোথা
প্রভাতে কুসুম-বনে,
প্রভাত-কুসুম-শোভা
ফুটিছে কুসুমাননে।
জিনিয়া ঊষার বিভা,
ললাটে লাবণ্য কি বা,
ফুটাইছে যেন দিবা
সে কিরণ বরিষণে।

শিশুর আনন্দে যেন
মাখায়ে মায়ের স্নেহ,
যুবার উৎসাহ দিয়া
গঠিত সে চারু দেহ;
চাহিলে সে মুখ পানে,
হৃদি ভেসে যায় গানে,
এ বিশ্ব মিশায় প্রাণে—
বাহিরে থাকে না কেহ

দেখে যেন হাসি তার
হেসে ফোটে বনে ফুল,
শুনে সে ললিত বীণা
গেয়ে ওঠে পাখীকুল ;
মধুর নিশ্বাস-বাসে,
অলি আসি ভ্রমে পাশে,
ধরা সে সঙ্গীত-ভাষে
জেগে ওঠে প্রাণাকুল।

আকাশের কোলে কোলে
সাগরের তীরে তীরে,
তারি কথা গেয়ে যায়
বায়ু যেন ধীরে ধীরে ;
সুদূর মেঘের ঘর
ছাড়ি যেন রবি-কর
হাসে তার কেশ'পর
মুকুট সাজা'তে শিরে।

শ্যামল পল্লব পত্র
ল'য়ে পুষ্প উপহার,
আগ্রহে প্রকৃতি থাকে
মুখ-পানে চেয়ে তার ;
সদানন্দময় চিত
সদা তার প্রমুদিত,
মধু ঋতু বিরাজিত
হৃদয়ের চারি ধার।

প্রাণের বাসনা যত
ছড়াইয়া ফুলবনে,
চির ফুল্ল ফুলে মালা
গাঁথিছে আপন মনে ;
স্বর্গীয় সুরভি ঘ্রাণ
জাগাইছে হৃদে গান,
যেতেছে মিশিয়া প্রাণ
স্বপ্নময় জাগরণে।

ভারতী—অগ্রহায়ণ, ১২৯৭

## সন্ধ্যায়

দেখ কে শয়িত হোথা
সন্ধ্যার বারতা ল'য়ে,
প্রাণের শোণিত বহে
নয়নের অশ্রু হ'য়ে।
কথা-বার্ত্তা হেথাকার
ফুরায়ে গিয়েছে তার,
কোথাকার সমাচার
মনে পড়ে র'য়ে র'য়ে

আকাশ-সমুদ্র-পারে
কি আছে তা ভাবে মনে,
গগনে ফুটিছে তারা—
আনমনে তাই গণে ;

বায়ু-স্পর্শে অনিবার
কেঁপে ওঠে হৃদি তার,
সভয়ে অদূরে কার
পদধ্বনি যেন শোনে

হৃদি-ফুলবন ছিন্ন
শোভাশূন্য একেবারে,
শুষ্ক চিতাকাষ্ঠ-রাশি
জাগে শুধু চারিধারে ;
বিশ্বের জীবন গ্রাসি'
উঠিছে ধ্বংসের হাসি,
নাচিছে মরণ আসি
হৃদয়ের দ্বারে দ্বারে।

জীবন-সর্ব্বস্ব শূন্য
দিবসের ঘোর রণে,
আঁধারে পথের সঙ্গী
খোঁজে তাই প্রাণপণে ;

আকুল হৃদয় তার
বিক্ষোভিত পারাবার,
নাহি শ্রান্তি ঝটিকার—
দীর্ঘশ্বাস ক্ষণে ক্ষণে

নাহি কি দেবতা মর্ত্তে
আসি' এ সাগর-তীরে,
আশার সুবর্ণ-দণ্ড
সঞ্চালিতে সিন্ধু-নীরে ;
আনিয়া স্বর্গের বর,
ঘুচাতে আর্ত্তের ডর,
মস্তকে সঞ্চালি' কর
শান্তি দিতে ধীরে ধীরে !

ভারতী—অগ্রহায়ণ, ১২৯৭

## রূপের সাগরে

বল       অসার অনিত্য রূপের সাগরে
              কেন, মূঢ়, তুমি ডুবিতে চাও ?
কেন      বাসনা করিয়ে সংসার-পাথারে
              আপনা আপনি হারায়ে যা'ও !
এ যে     অনন্ত দুর্লভ জীবন তোমার,
              হৃদয় তোমার শোভার ভাণ্ডার,
তবে      কি সুখের তরে—কোন্ প্রয়োজনে,
              সাধের সর্ব্বস্ব বিষাদে ছাও,
কেন      বাসনা করিয়ে সংসার-পাথারে
              আপনা আপনি হারায়ে যাও !

হেথা     ল'য়ে অশ্রুজল হৃদয়ের সাথী,
         করুণার গান গেয়ে দিবারাতি,
         মিছে কাজ নিয়ে ক'রে মাতামাতি
কেন           বিফলে জীবন কাটা'য়ে দাও ?
বল       অসার অনিত্য রূপের সাগরে
              কেন, মূঢ়, তুমি ডুবিতে চাও !

হেথা অকিঞ্চন তুমি কাঁদ যার তরে
ঘৃণিয়া তোমায় সে চায় অপরে,
অপর আবার তারে ঘৃণা ক'রে
তদন্যে বাঞ্ছয়ে—জান না তাও ?
তবে মোহ-ঘোরে কেন সংসার-পাথারে
আপনা আপনি হারায়ে যাও !

এ যে স্বপনের খেলা, স্বপনের হাসি,
কানে বাজে শুধু স্বপনের বাঁশী,
কেন উদাস পরাণ শুনিতে ও গান
আকুল হইয়া নিয়ত ধাও ?
বল অসার অনিত্য রূপের সাগরে
কেন, মূঢ়, তুমি ডুবিতে চাও !

কল্পনা—জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৪

# শারদীয় আবাহন

সুপ্রসন্ন ছায়াপথ বাহি' শরতের রথ
নামিয়া আসিল ধরাতলে,
দীর্ঘ বরষার পর স্বর্ণবর্ণ রবি-কর
ধরণীর বুকে ঝলমলে।
পাখী গায় কলভাষ, চামর ঢুলায় কাশ,
জলে ফোটে কুমুদ কমল,
চরণ-পূজার তরে শেফালী নীরবে ঝরে,
স্থলপদ্মে শোভিল ভূতল।
রক্তজবা ওঠে ফুটি', নীলের মাধুরী লুঠি'
ফুটিল অপরাজিতা রঙ্গে,
এস মা অপরাজিতা বঙ্গে।

হরিত শস্যের ক্ষেত্র দেখিলে জুড়ায় নেত্র,
বিছাইয়া দিয়াছে আসন,
এ আসনে যাঁরে চাই, ভাবিয়া ত নাহি পাই,
কি নামে করিব আবাহন।

ব্যাপ্ত যিনি বিশ্বময়, সৃষ্টি স্থিতি আর লয়
যাঁহার ইচ্ছার পরিণাম,
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জ্ঞান ল'য়ে তুচ্ছ চিন্তা ধ্যান
মানব কি দিবে তাঁর নাম!
তাই নাম দূরে রাখি' শুধু 'মা' বলিয়া ডাকি,
মা গো পূর্ণ কর অভিলাষ,
দেখায়ে পুণ্যের পথ, চালাও এ মনোরথ,
পাপের প্রগতি কর নাশ।

মাসিক বসুমতী—আশ্বিন, ১৩৪১

# তারা

নীরব নিথর আকাশ-সাগরে
রচিয়ে আনন্দ-মেলা,
কে তোরা রূপসী, জেগে সারানিশি,
কৌতুকে করিস্ খেলা ?
আকাশের কোলে কতই হাসিস্—
কতই গাহিস্ গান,
আঁধারের কোলে ফুটিয়ে উঠিস্—
আঁধারে জুড়াস্ প্রাণ।
অনন্ত আকাশে নিশির কুসুম—
নিশির শিশিরে স্নান,
সারা নিশি জেগে আনন্দে করিস্
নিশির শিশির পান।
উজল প্রখর তপন-কিরণ
নয়নে সহে নি ব'লে,
মুদি আঁখিপাতা ঘুমায়ে পড়িস্
দিবসে নভের কোলে।

সুখের প্রদেশে বুঝি বা তোদের
নড়ে না একটি শাখী,
সুখের স্বপন ভাঙ্গিতে তোদের
ডাকে না একটি পাখী।
অতি মৃদু বায় তরু-কোলে মৃদু
হেলে না একটি লতা,
কানে কানে বুঝি দুটি প্রাণীতেও
কহে না একটি কথা।
তোদের সুদূর সুনীল রাজ্যেতে
অবনীর কলরব,
পশিবার তরে বাসনা মাত্রেতে
ম'রে ঝ'রে পড়ে সব।
এ হেন বিজনে শয়ন রচিস্
ঘুমাতে দিনের বেলা,
স্বপনের মাঝে প্রাণে জাগে তবু
আঁধারের সনে খেলা।
সন্ধ্যার আরতি পবন বহিলে,
প্রদোষে বাজিলে বীণা,
মিটি মিটি আঁখি চাহিয়ে দেখিস্
তপন ডুবেছে কি না।

সেই শুভক্ষণ দেখিলে অমনি
মিলে সহচরী দল,
ছুটোছুটি ক'রে আসিয়ে সাজাস্
সুনীল গগন-তল।
সকলে তখন, আনন্দ উছাসে,
আঁধারে পূরিয়ে তান,
অসীমের কোলে শয়ন রচিয়ে,
অনন্তে গাহিস্ গান!
তোদের সঙ্গীত- সুধার ক্ষরণে
অধর নাহিক নড়ে,
অনিমিখ ওই ভাবের আঁখিতে
পলক নাহিক পড়ে।
নীরবতা সেথা কান পেতে যেন
শোনে সে সঙ্গীত ব'সে,
স্তুতিবাদ-ছলে নীরবতা তার
মুখ হ'তে পড়ে খ'সে।
তবু সে সঙ্গীত অনন্ত অসীম
দিগন্তের কোলে ফুটে,
ভেদিয়া অনন্ত আঁধারের স্তর
অসীম অনন্তে ছুটে।

সংসারের জ্বালা অসীমে মিলা'তে
আকাশের পানে চাই,
আঁধারে তোদের সে সঙ্গীত শুনি'
কি-যেন-কি হ'য়ে যাই।
আঁধারের কারা ভেদিয়া যে আমি
এসেছি আঁধার হ'তে,
সারা দিন রাত গেয়ে গেয়ে ভেসে
চলেছি আঁধার-স্রোতে।
কত নদী বন— দেশ দেশান্তর—
অচল সমুদ্র-পারে,
পৃথিবী ছাড়িয়ে সুদূর অসীমে,
পৃথিবীর কোন্ ধারে—
জানি নে ত কিছু সে আবার কোন্
অজানা আঁধার দেশে,
ভাসিয়ে ভাসিয়ে গাহিয়ে গাহিয়ে
গিয়ে যে ঠেকিব শেষে!
জীবনের পথে খুঁজি আমি তাই
একটি সঙ্গীত-সাথী—
অনন্ত আঁধারে পথ দেখাইতে
একটু আলোক-ভাতি।

তোরা সে আমার আলোকের মালা—
আঁধারের ধ্যানে রত,
নিরখি তোদের প্রাণে আমি তাই
পাই সে সান্ত্বনা কত।
আয় রে আমার সঙ্গীতের সাথী,
আমারে নে হোথা তুলে,
সংসারের মায়া— অসার বাসনা—
সব যাই আমি ভুলে।
ও অনন্ত ধ্যান— অনন্ত সমাধি—
ঢেলে দে আমার প্রাণে,
নীল নভ-কোলে বিভোর হইয়ে
জুড়াই এ জ্বালা গানে।

প্রচার—অগ্রহায়ণ, ১২৯৩

# অতৃপ্তি

বাঞ্ছিত আমার তুমি হে—
তুমি প্রাণময় !
আমি চাহি না তোমারে বঁধু
এখানে,
এখানে তোমারে চেয়ে,
এখানে তোমারে পেয়ে,
পেয়েছি বেদনা বড়
পরাণে—
আর চাহি না তোমারে বঁধু
এখানে :

হেথা দেখিয়া পূরে না বঁধু
বাসনা,
হৃদয়ে শুকায়ে মরে
কামনা ।

তিলেকে ফুরায় হাসি,
বাজে না প্রাণের বাঁশী,
ঢাকে সুখ আঁধারের
বিতানে—
আর চাহি না তোমারে বঁধু
এখানে।

হেথা বিরহ মাখান নীল
আকাশে,
হা হা রব ওঠে শুধু
বাতাসে ;
প্রাণের আকুল গান
কেঁদে হয় অবসান,
প্রেমের সমাধি হয়
শ্মশানে,
আর চাহি না তোমারে বঁধু
এখানে !

সেথা জীবন জুড়াব যদি
দেখা পাই,
মরণ চরণ-তলে
দেয় ঠাঁই ;
গঠি চির-বিনোদন
বাসনার উপবন,
পরাণ মাতা'ব সেথা
সে গানে—
আর চাহি না তোমারে বঁধু
এখানে !

প্রচার—আষাঢ়, ১২৯৪

# কোথা মা

কোথা মা, কোথা মা শান্তি রাণী,
দারুণ তৃষ্ণায় প্রাণ হয় বুঝি অবসান,
ঢেলে দে মা শান্তি-সুধা আনি'।

দুর্গম পর্ব্বতে এ যে অরণ্যে হারানু পথ,
সম্মুখে অনন্ত গুহা অন্ধকার ভবিষ্যৎ;
জ্যোতিঃ-শূন্য তাপরাশি যেন মা গ্রাসিতে আসি'
আপনার দিকে লয় টানি'।

কি ঘোর নেশায় মেতে কি এক স্বপন-ভরে,
অসুখের মাঝে যেন ছুটেছি সুখের তরে;
পদে পদে দুঃখ সহি, তবুও নিবৃত্ত নহি,
কি রহস্য কিছু ত না জানি।

ভাঙ্গি' পড়ে গিরিচূড়া যেন শত বজ্রাঘাতে,
মাঝে মাঝে শুনি ধ্বনি—কাঁপে মা হৃদয় তা'তে ;
ভয়ে সারা হই প্রাণে, শুনিতে না পাই কানে
আশার অমৃতময় বাণী !

পেলে মা করুণা-বিন্দু দুখ-সিন্ধু যাব ভুলে,
বারেক বিপন্ন দেখে চাহ গো মা মুখ তুলে ;
জীবন সফল ক'রে দেখি মা নয়ন ভ'রে
স্নেহ-মাখা তোর ও মু'খানি !

ভারতী—

# বসন্ত

আমি    এসেছি আবার
নবীন উষায়
অরুণ-কিরণ মাখি' ;
মনের দুয়ার
খুলিয়ে আমায়
ডেকেছে বনের পাখী
আমায়    বিটপী ডেকেছে
বিষাদ সহিয়া,
মলয় ডেকেছে
মধুরে বহিয়া,
আবার    ডেকেছে লতিকা
আদর করিয়া
ফুটায়ে কুসুম-আঁখি !

মধুর গুঞ্জরি
    এসেছে ভ্রমর
খুঁজিতে আমারে
    কানন-ভিতর,
আবার খুঁজিয়া আমারে
    নলিনী কাতর
    সলিল-শয়নে থাকি'।
মানস আমার
    করিতে তোষণ
কোকিলে ভাষিছে
    মধুর ভাষণ,
আবার ধরণী পেতেছে
    হরিত আসন,
আমি দেখিতে পাই নে তা কি!

সং।—১৮৯৬

# হরিষে বিষাদ

আহ্লাদী বিষণ্ণ দুঃখেই কাটে দিন—
ছেলেটির আয়-উপায় কম,
ঠাকুরকে কত ডাকে, মুখ তুলে নাহি চান,
কোলেও না টেনে নেয় যম।

এ দুঃখ-কষ্টও বরঞ্চ সহে তার,
সব চেয়ে বড় তার দুখ,
বুড়ো হ'তে যায় সে পেলে নাকো দেখ্‌তে
নাতির যে চাঁদপানা মুখ।

ষোলয় পা দিল বৌ, তবু নয় গর্ভিণী,
হায় এ কি ঠাকুরের সাজা,
আবাগীর বেটিটাকে কেন ঘরে আন্‌লেম,
শেষকালে হলো কি না বাঁজা !

আধ্‌লা ও গোরুটার সেবায় গতর গেল—
এত ক'রে ভগবানে ডাকি,
সে-ও না গাভীন হলো কপালের দুর্ভোগ—
বোয়ের বাতাস পেলে না কি?

মনের বিষাদ ল'য়ে আহ্লাদী সদা রয়,
কষ্টেই কাটে তার দিন,
পারিল জানিতে শেষ বৌটি পোয়াতী তার,
গোরুটিও হয়েছে গাভীন।

কে দেখে আনন্দ তার, তুলসীতলায় গিয়ে
কহে কত মানসিক করি',
গড় করে, মাটি খায়— এত দিন পরে বুঝি
মুখ তুলে চাহিলেন হরি।

হেনকালে একদিন পাড়ায় গণক এলো,
ছিটে-ফোঁটা নামাবলী গায়,
মুখে হরি-হরি বোল, কাঁধে চাউলের ঝুলি,
বগলেতে পুথি শোভা পায়।

পাড়ার যতেক মেয়ে সবাই আসিল ছুটে—
এসেছেন গণক ঠাকুর,
যার যা অভাব আছে, যার যা মনের ব্যথা,
সব তিনি করিবেন দূর।

কেহ বা দেখায় হাত, কেহ করে প্রণিপাত
ভক্তিতে ভূমিতলে লুটে,
গণক এসেছে শুনে, ফেলিয়া হাতের কায,
আহ্লাদী গেল সেথা

গলায় কাপড় দিয়ে গণকে প্রণাম করি'
সমুখে দাঁড়ায় যোড়হাত,
গণক গম্ভীরভাবে তার দিকে চেয়ে কয়—
"প্রসন্ন মা তোয় জগন্নাথ।"

আহ্লাদী ধীরে কয়— "প্রসন্ন ত বটে বাবা,
তবে কি না পাব কি সুদিন—
আশীর্ব্বাদ কর প্রভু— বউটি পোয়াতী মোর,
গোরুটিও হয়েছে গাভীন।"

এক পাশে ছিল বউ, শাশুড়ীর ইসারায়
গণকে করিল প্রণিপাত,
"এইটি আমার বউ" আহ্লাদী দিল ব'লে,
দেখাইল তাঁরে তার হাত।

গণক দেখিয়া কয়— "কি সুন্দর হস্তরেখা,
সর্ব্ব শুভযোগের উৎপত্তি,
ব'লে রাখি শোন্ বেটী— অখণ্ড্য আমার বাক্য,
পুত্র হ'বে রাজচক্রবর্ত্তী।"

আনন্দে ডগ-মগ আহ্লাদী আশা পেয়ে
জিজ্ঞাসে কথাটি গোরুর,
খড়ি পেতে একমনে গণক বলিল গ'ণে
"হ'বে তার বকনা বাছুর।"

গণকের কথা শুনে, আশ্বাস পেয়ে মনে,
আহ্লাদী আহ্লাদে মগ্না,
বউটির হবে এক চাঁদপারা ছেলে, আর
গাইটির হবে এক বক্না।

ঠাকুরকে গড়-করা, হরির সে মাটি-খাওয়া,
একদম্ বেড়ে গেল তার,
যার তার কাছে সেই যখন তখন বলে,
"ঠাকুরের সেবাই ত সার।

হরি যে গো দয়াময়, মুখ তুলে যদি চান,
দুঃখ কি তবে আর থাকে ?
মানুষের পাপ মন, সবাই তা বোঝে কই,
দিনান্তে তাঁয় নাহি ডাকে।"

হেনকালে একদিন ভোরবেলা শোনে লোকে
আহ্লাদী কাঁদে ডাক ছেড়ে,
বউ তার কন্যা প্রসবের পরেতেই
গাইটিও বিয়ায়েছে এঁড়ে।

এর পর থেকে তার মাটী-খাওয়া গড়-করা
সব গেল গোল্লার তল—
যে হরি না কথা শোনে, অনুরোধ নাহি রাখে,
সে হরিতে কিবা আছে ফল ?

আহ্লাদী বলে রাগে "সাধে হয় 'খ্রিষ্টান'
জগতে ঠাকুর নাই আর,
আবাগা সে গণককে পাই যদি দেখ্‌তে
মুখখানা পুড়িয়ে দি তার!"

বসুমতী—আশ্বিন, ১৩৩৪

# সান্ত্বনা

কে তোমরা কাঁদ মোর তরে—
কে তোমরা সংসারের জীব,
আমি ত গো তোমাদের নই ;
একদিন ছিনু তোমাদের,
কেঁদেছিনু তোমাদের মত,
সংসারের দুঃখ বুকে সই' ।

মায়ার স্বপনে আত্ম ভুলে
যত দিন ছিনু আমি হোথা
দেখে শুনে তোমাদের মুখ,
তোমাদের আনন্দ-উল্লাসে
তোমাদের রোগ-শোক-দুঃখে
পেয়েছি গো বহু দুঃখ সুখ ।

হোথা যে রব না চিরদিন
জানিতাম এ কথা তখনো,
কিন্তু মনে পায় নি তা ঠাঁই,
প্রবাসে হইয়ে আত্মহারা
ভুলিলাম নিজের সম্বল,
আজও তাই কত ব্যথা পাই।

আপনার কাজ ভুলে গিয়ে,
অসার ভাবনা ভেবে ভেবে
তোমরাও কেঁদ না গো আর,
মোর মত বড় ব্যথা পাবে,
কাতর হইবে বড় প্রাণে,
দুঃখের না হবে প্রতীকার।

তোমাদের স্নেহের পুতলী,
তোমাদের স্নেহহারা হয়ে
এসেছি ব'লে কি পাও ব্যথা ?
হেথা কি গো স্নেহের অভাব ?—
অবারিত অনন্ত স্নেহের
কোলে আমি শুয়ে আছি হেথা

মায়ার শিকল কেটে দিয়ে,
অসার বাসনা ছুড়ে ফেলে'
এসেছি গো আপনার দেশ,
তোমাদের অনিত্য ভাবনা
এখানে আমার কিছু নাই,
নাই কিছু সংসারিক ক্লেশ।

খুলে ফেল মায়ার শৃঙ্খল,
ছেড়ে দাও অসার ভাবনা,
তোমরাও মোরে ভুলে যাও,
জগতের গতি এইরূপ,
চিরদিন এইরূপ হ'বে,
তবে কেন কেঁদে কষ্ট পাও!

প্রচার— চৈত্র, ১২৯২

## দ্বন্দ্ব-শেষ

মহারাণা প্রতাপ তাঁহার সহোদর
শক্তসিংহ আর সঙ্গে বহু অনুচর
মৃগয়ায় করিলা গমন ;
বন্য এক বরাহ সম্মুখ দিয়া তাঁর
দ্রুতগতি ছুটিয়া চলিল ভীমাকার,
প্রতাপ তা নিরখিয়া,
আনন্দে উন্মত্ত হিয়া
করিলেন শেল-নিক্ষেপণ।

ঠিক সেই ক্ষণে আচম্বিতে,
অন্যদিক্ হইতে চকিতে
আর এক শেল আসি' বরাহের গায়
বিঁধিল— বরাহ পড়ি' ভূতলে লুটায়

বরাহ ভূতলে লুটোপুটি,
দেখিবারে সবে আসে ছুটি',
মহারাণা আসিলেন কৌতুক উল্লাসে,
শক্তসিংহ আসি' তাঁর দাঁড়াইলা পাশে।

রাণা কন—"অব্যর্থ সন্ধান,
তাই অতি দ্রুত ধাবমান
বরাহেও অবহেলে করিনু বিনাশ"।—
শুনি' শক্তসিংহ বীর হাসে মৃদু হাস।

রাণা দেখি' ক'ন তাই,
"কি হেতু হাসিলে, ভাই ?"
শক্তসিংহ দৃঢ়স্বরে কহিলা তখন—
"মোর শেলাঘাতে হ'ল বরাহ নিধন।"

নিজ বাক্য রাখিবার তরে,
বিতণ্ডা তখন পরস্পরে,
ক্রমে ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইলা দু'ভাই,
ক্ষিপ্তপ্রায়—দিগ্বিদিক্ জ্ঞান আর নাই !

তখন প্রতাপসিংহ রোষে,
হাত দিলা নিজ অসি-কোষে,
অনুজে কহিলা—"ভাল, কার কত শিক্ষা,
এস, দ্বন্দ্বযুদ্ধে হোক্ তাহার পরীক্ষা।"

শক্তসিংহ ক্ষিপ্ত সিংহ প্রায়
উৎসাহে সম্মতি দিলা তায়;
"সহজ উপায় সঙ্গে থাকিতে এমন,
মিছামিছি বিতণ্ডার কি বা প্রয়োজন?"

বীরোচিত সৌজন্যে তখন,
অগ্রজের চরণ-বন্দন
করিলেন বীরবর শক্তসিংহ গিয়া—
আশিসিলা রাণা তাঁর শিরে হাত দিয়া।

অশ্বপৃষ্ঠে উঠি' তার পরে,
দুই জনে তরবারি করে
পরস্পর পরস্পরে করেন আঘাত,
দোঁহার সর্ব্বাঙ্গ বাহি' হয় রক্তপাত!

চারিদিকে বহু লোক হায়,
দাঁড়াইয়া হতভম্ব প্রায়,
এ কি হ'ল—এ কি এরা করে দুই ভাই,
গেল—গেল—এইবার আর রক্ষা নাই !

হেন কালে কুল-পুরোহিত
রুদ্ধ-শ্বাসে আসি' উপস্থিত ;
দূর হ'তে কাণ্ড দেখি' মনে ভয় বাসি'
দাঁড়াইলা উভয়ের মাঝখানে আসি'।

"কি কর—কি কর, বৎসগণ,
এ যে কুলক্ষয়ের লক্ষণ ;
ক্ষমা দাও, ক্ষান্ত হও, রাখ অনুরোধ,
ভেবে দেখ কার প্রতি কে করিছ ক্রোধ !"

অনুনয় করি' বিধি-মত,
এইরূপে বুঝাইলা কত,
কিন্তু তাঁর কাতরতা, বহু অনুনয়
টলাইতে না পারিল কাহারো হৃদয়।

তখন দারুণ ব্যথা মনে
পেয়ে তিনি কহিলা দু'জনে—
"বৎসগণ, রক্ত যদি এত প্রিয় হয়,
লহ রক্ত—রাখ শিশোদীয় কুলক্ষয় !"

এত বলি' ছুরিকা লইয়া
নিজ বক্ষে দিলা বসাইয়া,
বেগে রক্তধারা ছোটে,
ব্রাহ্মণ ভূতলে লোটে,—
হিতৈষীর এইরূপ আত্ম-বলিদানে,
কি ভীষণ অনুতাপ দেখা দিল প্রাণে,
অবনত উভয়ের উদ্যত কৃপাণ,
উভয়ে নিস্তব্ধ যেন অচল পাষাণ !

বার্ষিক শিশুসাথী—১৩৩৬

# চিঠি আসায়

চিঠির উপর কেবল আসে চিঠি,
লিখ্‌তেও ত এত সময় পায়,
কেবল চিঠি লিখ্‌তেই কি তবে
ফয়রা ক'রে বিদেশেতে যায় ?

আমাদের কি কাজ নাইকো ঘরে,
ব'সে ব'সে পড়্‌বো কেবল চিঠি,
জবাব দিতে থাক্‌বো পরে পরে,
বুঝে ত কেউ দেখ্‌বে না কো ইটি !

পোষ্ট্‌কাড্‌ আর টিকিটগুলো ছাই,
কিন্‌তেও ত খরচ আছে তাতে,
মানুষটির আর যোড়া মিলে নাই—
পয়সা যেন কামড়াচ্চে হাতে !

ভারতবর্ষ—ভাদ্র, ১৩৪১

## চিঠি না আসায়

রাত পোহালে বৃহস্পতিবার
ন' দিন হবে—
বুধে-বুধে আট-দিন আজ যায়,
কোনও খবর এলো না কই তার,
কাল্‌কে তবে
বিপিন, কি তুই যাবি কল্‌কাতায় ?

বিদেশেতে আখ্‌ছারই ত যায়,
চিঠি দিতে
কিন্তু এমন করে না ত দেরি,
চিঠির উপর চিঠি আসে ঠায়,
খবর পেতে
না পেতে ঠিক চিঠি আসে ফেরই।

আমরা বরং করি তাতে ঘৃণা

দেখি দোষই—

চিঠি লেখা লোকটার এক বাই,

আজ বুধবার—আট-আট-দিন কি না

সেই মানুষই

কাগের মুখেও খবর দিল নাই !

ভারতবর্ষ—ভাদ্র, ১৩৪১

# শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্র বহু পরিশ্রমে
যত্নে চর্চ্চা করি' যাহা না বুঝে বিদ্বান্,
না পড়িয়া তুমি, দেব, অবলীলাক্রমে
পেয়েছিলে সে জ্ঞানের নিগূঢ় সন্ধান।
শাস্ত্রের কঠিন মর্ম্ম তোমার শ্রীমুখে
বাহিরিত যবে হয়ে সহজ সরল
চলিত দৃষ্টান্ত সহ, ধরিতে তা বুকে
জ্ঞানী মূর্খ সমভাবে হয়েছে পাগল।
নানা জাতি, নানা শ্রেণী, নানা মত তাই,
নানা রূপ মুক্তিপথ নানা ধর্ম্মমতে,
কালী-কৃষ্ণ শিব-রামে ভেদ মাত্র নাই,
সাধনায় নিজে তাহা দেখালে জগতে।
সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় তোমার জীবনে,
করিল বিস্মিত মুগ্ধ বিশ্ববাসী জনে।

মাসিক বসুমতী—অগ্রহায়ণ, ১৩৪১।

# রামমোহন

বাঙ্গালার বহুবিধ হিতব্রতে ব্রতী
কৃতিপুত্রগণ-নাম করিতে স্মরণ,
সর্ব্বাগ্রে সবার দৃষ্টি পড়ে তব প্রতি
প্রতিভার বরপুত্র হে রামমোহন।
বহুভাষাভিজ্ঞ তুমি, বিভিন্ন জাতির
ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞানে ছিলে বৃহস্পতি প্রায়,
বিদেশীয় ভাব-বন্যা যখন অস্থির
করিল এ বঙ্গ, তুমি রক্ষিলে তাহায়।
হিন্দুশাস্ত্র মন্থি' তুমি একেশ্বর-বাদ
আনি' দিলে বাঙ্গালীর জীবন-প্রভাতে,
নিবারিলে সতীদাহ নিষ্ঠুর প্রমাদ
ঘটিত প্রায়শঃ যাহা পর-প্রেরণাতে।
বঙ্গভাষা বাঙ্গালীর প্রাণবস্তু জানি'
দিয়াছ তারেও রূপ তুমি মহাজ্ঞানী।

# প্যারীচরণ

প্রদীপ্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ হৃদয়-ভাণ্ডার,
কালিমার লেশশূন্য চরিত্র নির্ম্মল,
সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি, দয়ার আধার—
একাধারে দেখাইতে আদর্শ উজ্জ্বল
এসেছিলে ধরি' তুমি মানব-আকার
স্বর্গ হ'তে দীন বঙ্গে, স্নিগ্ধ সুশীতল
মন্দাকিনী-ধারা বহি' বঙ্গের মাঝার—
সুরাবিষে মত্ত যেথা যুবকের দল।
নর-নারী উভয়ের হিতব্রত সার
করেছিলে একমাত্র জীবন-সম্বল,
ছাত্রগণে পিতৃতুল্য দিয়া ব্যবহার
ফুটাইলে তাহাদের হৃদয়-কমল।
তব সম সর্ব্বগুণে গুণী মহাত্মার
দেখা কি মিলিবে পুনঃ এ বঙ্গে আবার!

মাসিক বসুমতী—কার্ত্তিক, ১৩৪১।

# ভূদেব

জ্ঞানের সমুদ্র, শাস্ত্রে দৃঢ় ভক্তিমান্,
সংযমের প্রতিমূর্ত্তি,—সমাজ-সংসার-
স্বদেশ-চিন্তায় নিত্য নিয়োজিত প্রাণ
করেছে অন্বর্থ নাম ভূদেব তোমার।
বিজাতীয় ভাবে মত্ত তার্কিকের দল
এদেশীয় সামাজিক সাংসারিক সুখ
নাশিতে আইল যবে হইয়া প্রবল,
দাঁড়ালে বিরুদ্ধে তুমি পেতে দিয়ে বুক।
কর্ম্মযজ্ঞে সদা রত, লক্ষ্য মহত্তর,
অবিচল ভক্তি পিতৃপুরুষের নামে,
অর্পি স্বোপার্জ্জিত দেশহিতে দাতবর,
নিশ্চিন্ত হইয়া তাই গেলে দিব্যধামে।
শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, শ্রেষ্ঠ ভক্ত, শ্রেষ্ঠ কর্ম্মবীর,
ধন্য তুমি সুপুত্র এ বঙ্গ-জননীর।

# বঙ্কিমচন্দ্র

( আবির্ভাবে )

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা জননী
   গ্রহবশে শীর্ণা যবে মগ্না দুঃখ-কূপে,
সপ্তকোটি পুত্র তাঁর শুধু ভাগ্য গণি'
   নিদ্রা যায় আলস্যের অবতার-রূপে,
সে সময়ে দেবতার আশীর্ব্বাদ-বাণী
   স্বর্গ হ'তে ল'য়ে নামি' দেবদূত তুমি
দেখা দিলে ঘুচাইতে মা'র দুঃখ গ্লানি,
   জাগাইতে মহামন্ত্রে সুপ্ত বঙ্গভূমি।
আদিত্য-উদয়ে যথা জাগে জীবলোক—
   পূর্ণ হয় ধরাতল হর্ষ-কলরবে,
তোমার উদয়ে তথা, ও হে পুণ্যশ্লোক,
   সচেতন হইল এ বঙ্গবাসী সবে—
পশু-পক্ষী নর-নারী স্থাবর-জঙ্গম
গাহিয়া উঠিল উচ্চে "বন্দে মাতরম্"।

মাসিক বসুমতী—কার্ত্তিক, ১৩৪১।

# হরপ্রসাদ

( প্রয়াণে )

প্রবীণের শেষ, নবীনের যাত্রা সুরু—
সেই সন্ধিক্ষণে, খ্যাত পণ্ডিতের কুলে
জন্ম লভি' তুমি হে কোবিদকুল-গুরু,
সুধন্য করিলে দেশ প্রতিভা অতুলে।
ভারতী দিলেন তব কণ্ঠে মণিহার—
নানা ভাষা—প্রীতিভরে সহাস্যবদনে,
স্বদেশের পুরাতত্ত্ব করিতে উদ্ধার
দিলেন অতুল শক্তি সুপ্রসন্ন মনে।
শিরে ধরি সে আদেশ প্রিয় পুত্র তাঁর
দিলে বহুশ্রমে ডালি তাঁহার চরণে,
ভাষায় নবীন শক্তি করিয়া সঞ্চার
পূজিলে তাঁহারে নব মন্ত্র উচ্চারণে।
তাই কর্ম্মক্লান্ত দেহ দেখিয়া তোমার
লইলেন যত্নে মাতা কোলে আপনার।

মাসিক বসুমতী—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮।

# শ্রীমতী হেমলতা দেবী

( স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা, স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র ও যতীশচন্দ্র সমাজপতি ভ্রাতৃদ্বয়ের মাতা )

কে মা তুমি, দেবাঙ্গনা, বিধবার বেশে,
জগতের মাতৃস্নেহ বুক ভ'রে ল'য়ে
বিরাজিছ বঙ্গগৃহ-কোণে একদেশে
লোক-লোচনের দৃষ্টি-বহির্ভূতা হয়ে।
সতত ঈশ্বর-চিন্তা, ঈশ্বরে নির্ভর,
তাঁহারি আদেশ যেন পালিতে যতনে,
শ্রমে ক্লান্তি নাই, দুঃখ-কষ্টে নাহি ডর,
দিয়াছ এ সবি বলি তাঁহার চরণে।
নিজপুত্র-পরপুত্রে স্নেহ সমভাগে
নিরখি' বিধাতা বুঝি পরীক্ষার তরে,
তব পুত্রদ্বয়ে পাশে নিলা ডাকি' আগে,
কিংবা বাড়াইতে তব নির্ব্বেদ অন্তরে ?
বুঝি না নিগূঢ় তত্ত্ব—মা গো শুধু জাগে
তোমার চরণ-পদ্ম হৃদি-সরোবরে।

মাসিক বসুমতী—অগ্রহায়ণ, ১৩৪১।

# আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

( জন্মতিথি-উৎসব উপলক্ষে )

ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতনিষ্ঠ ধার্ম্মিক-প্রবর,
স্বদেশ-কল্যাণে আত্মনিবেদিত-প্রাণ,
সরস্বতী-বরপুত্র, বৈজ্ঞানিক-বর
দ্বিসপ্ততিতম বর্ষে আজি আগুয়ান।
জয়ন্তী উৎসব তাঁর প্রতি প্রতিষ্ঠানে
মহানন্দে আজি তাই হয় অনুষ্ঠিত,
কিন্তু তিনি সর্ব্বকালে আর সর্ব্বস্থানে
প্রশংসা বা নিন্দায় না হন বিচলিত।
ল'য়ে সদানন্দময় বালকের প্রাণ
একাগ্র মনেতে নিজ সাধনায় রত,
শুধু স্বদেশের হিত উদ্দেশ্য মহান্
একমাত্র তপ তাঁর জীবনের ব্রত।
কোন-প্রলোভনে তপ টলে না কো তাঁর,
স্থির লক্ষ্য—অচল অটল নির্ব্বিকার।

মাসিক বসুমতী—পৌষ, ১৩৩৯।

# গিরিশচন্দ্র

অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের অশীতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে )

হে সুধী, মঙ্গল-শঙ্খ আর হুলুধ্বনি
ঘোষিছে অশীতিতম জন্মতিথি তব,
শুনিতে না চাহ নিজ প্রশংসার ধ্বনি,
তাই এই উৎসব এ বঙ্গে অভিনব।
পাশ্চাত্যের জ্ঞান-রত্নে হৃদয়-ভাণ্ডার
পূর্ণ করি' বাণী-বরপুত্র মনোমত,
জ্ঞান-বিতরণ নিজ জীবনের সার
করিয়া, লইলে বাছি' সেই মহাব্রত।
আহারে বিহারে ব্যবহারে পরিচ্ছদে,
স্বদেশীর সমাদর জীবনে তোমার
দেখাইল বঙ্গবাসিজনে প্রতিপদে
জাতীয়তা কি যে বস্তু, কি যে মূল্য তার।
হে সাধুসত্তম, শান্ত জ্ঞান-পারাবার,
পূর্ণ শত বর্ষ আয়ু হউক তোমার।

মাসিক বসুমতী—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯।

# অমৃতলাল

( বিয়োগে )

হে বৃদ্ধ—নবীন যুবা, কৌতুক-সাগর,
বাগ্মিবর, নাট্যাচার্য্য, নটচূড়ামণি,
দণ্ডিতে ভণ্ডেরে তুমি রচিলে বিস্তর
ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কাব্য অমৃতের খনি।
জাতি-সম্প্রদায়-ভেদ তোমার গোচর
ছিল না, ছিল না ভেদ জ্ঞানী কিংবা ধনী,
বুঝিলে অন্যায় তুমি তীব্র শ্লেষ-শর
বিঁধেছ সবার বক্ষে অমনি তখনি।
স্বদেশীয় ভাবে মত্ত ওহে যাদুকর,
তব সিদ্ধ যাদুমন্ত্র-প্রভাব এমনি,
গুণে তার বঙ্গ ব্যাপি' বহু নারী-নর
স্তব্ধ হয়েছিল যথা মন্ত্রমুগ্ধ ফণী।
শুভ্র কেশে শুভ্র বেশে যাও কবিবর,
বহে যথা শুভ্র স্বচ্ছ অমৃত-নির্ঝর।

মাসিক বসুমতী—শ্রাবণ, ১৩৩৬।

# চিত্তরঞ্জন

( প্রয়াণে )

নারায়ণে ভক্তিমান্ জ্ঞানী কর্ম্মবীর
হে মহাপুরুষবর, ইন্দ্রালয়ে আজি
চলিলে করিয়া সাঙ্গ কর্ম্ম পৃথিবীর—
দুন্দুভি জানায় বার্ত্তা সুরপুরে বাজি'।
একদা প্রভূত শক্তি করি কেন্দ্রীভূত
সৃজিলা তোমারে ধাতা—অভিনব দান—
মরণে সে শক্তি হয়ে বিসর্পিত দ্রুত
প্রতি বঙ্গবাসি-হৃদে লভিলেক স্থান।
একতায় সে বিচ্ছিন্ন শক্তিরাশি যবে
একীভূত হবে—হ'বে মঙ্গল মহান্,
উদিবে স্বরাজ-সূর্য্য, কিরণ-বৈভবে
অযুত বিদ্যুত-দীপ্তি করি' পরিম্লান!
কোটি কণ্ঠে নর-নারী গাহিবেক তবে
তব জয়— মহোৎসাহে অতুল গৌরবে।

মাসিক বসুমতী—শ্রাবণ, ১৩৩২।

# সুখের চরম

আজি মনে পড়ে, নাথ, পূর্ব্বকথা যত—
　　কোথা তুমি, কোথা আমি—বিধির ঘটনে
কেমন মিলিনু দোঁহে—পূর্ণ অনুগত
　　হইলাম পরস্পর—ভেদ নাহি মনে।

তার পরে কত দিন বাহুর বন্ধনে
　　বাঁধিয়াছ অধিনীরে সোহাগে সে কত,
কি মধু দিয়াছ ঢালি' মধুর চুম্বনে,
　　ত্রিদিবে নাহিক কিছু বুঝি তার মত।

কিন্তু হয় নাই, নাথ, পূর্ণ মোর সুখ—
　　জাগিছে হৃদয়ে তবু অতৃপ্তি বিষম,
তব কোলে মাথা রাখি', দেখি' হাস্যমুখ
　　মরিবারে পারি যদি মৃত্যু মনোরম,
বাসনার পরিতৃপ্তি, মরণে কৌতুক,
　　সেই দিন হবে মোর সুখের চরম।

বার্ষিক বসুমতী—১৩৩৩।

# মোহিনী

অনন্ত সুষমাময়ী বিশাল ধরণী
তৃপ্তি-সুখ-সৌন্দর্য্যের বিপুল সম্ভার
আদরে আপন বক্ষে ধরেন জননী
জীবের মঙ্গল হেতু—স্নেহে অনিবার।
হাসে চন্দ্র, ফোটে ফুল, পিক-কুহুধ্বনি
শ্রবণে অমৃত ঢালে ভ্রমর-গুঞ্জন,
বহে স্নিগ্ধ মলয়ের পবন আপনি
জন্মান্তর-স্মৃতি যেন পরশে জীবন।
কি অভাব এর মাঝে ছিল নাহি জানি—
জানিতাম এ ধরায় এই মাত্র সবি,
তুমি আসি সে সমস্যা পূরাইলে, রাণী,
দেখালে নূতন দৃশ্য—সম্মোহন ছবি।
জানি না, মোহিনী, তুমি দেবী কি মানবী,
জানি মাত্র করিয়াছ অকবিরে কবি।

বার্ষিক বসুমতী, ১৩৩৪।

# বাসন্তী নিদ্রা

( স্থানে স্থানে গুরু উচ্চারণ করিয়া পড়িতব্য )

বিজনে বাসন্তী দেবী সন্তোষে ঘুমায়,
ফল-ফুল-মুকুল-শোভিত কল্প- তরুর ছায়ায়।

চরণ-তলে অদূরে নীল তটিনী বহে তর তর,
সুদূরবন-হৃদয় লুঠি' মলয় ভাষে সর সর,
বনজ ফুল ঝর ঝর ঝরিয়ে পড়ে গায়।
ধরণী-নব-সংগঠনে শ্রান্তি-ভরে অবনতা,
ললাটে স্বেদবিন্দু ঝরে, অঙ্গ বেড়ি অলসতা,
বীজনে বসন্ত-লতা কুন্তল দোলায়।
ধবল চারু চন্দ্র-কর ধরণী-বুকে পড়ে ঢলি'
শ্যামল বন পুলকে হাসে,উছাসে হাসে ফুল-কলি ;
কুহরে পিক, সিহরে অলি, পাপিয়া গীত গায়।
শ্যামল ছায়ে খুঁজি' খুঁজি' জোছনা আসি পড়ে মুখে,
মুদিত আঁখি নিচল দেখি' স্বপন খেলা করে বুকে,
মিলিত ষড়ঋতু সুখে প্রণতি করে পায়।

ভারতী—জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৪।

## শেষ

গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল, আঁধার আজি কুঞ্জবন,
( আর ) গাহে না পাখী, ফুটে না কলি, নাহিক অলি-গুঞ্জরণ।
দুলাতে মৃদু লতিকা বনে, খেলিতে নব-কলিকা সনে,
মধুরতর নাহি সে আর সমীর-ধীর-সঞ্চরণ।
কাননে ঢালি জোছনারাশি ভাসে না চাঁদ গোকুলে আসি,
নাহি সে হাসি প্রমোদ-রাশি, নাহি সে সুখ-সম্মিলন।
জলদে শশি-মাধুরী ঢাকা, বিষাদ যেন সকলে মাখা,
শ্রীহীন তরু, শ্রীহীন লতা, শ্রীহীন চারু পুষ্পবন।
অমিয় স্বর-লহরে মাখি' স্তবধ করি পশু-পাখী,
মধুরভাষী আর সে বাঁশী গাহে না গীত সম্মোহন।
যমুনা পানে চাহিলে ফিরে, কপোল ভাসে নয়ন-নীরে,
পরাণে শুধু উছলি উঠে সুনীল জলে সন্তরণ।
নিবিড় বনে তমাল-ছায়, কোকিল-বধূ গীত না গায়,
সারিকা-শুক বিরস-মুখ বিগত প্রেম-সম্ভাষণ।

অধীর ব্রজ-বালকদল, না খায় ধেনু তৃণ কি জল,
সজল আঁখি ঊরধ-মুখে করিছে কি যে অন্বেষণ ।
প্রেমিক কে সে মধুরভাষী বধিয়ে গেল গোকুলবাসী,
ব্রজে কি আর বাঁশরী তার গা'বে না গীত সঞ্জীবন ?
অধীর প্রাণে বিষম ক্লেশ, কেমনে করি এ দুখ শেষ—
বিনে শ্রীহরি কেমনে করি নয়ন-বারি সম্বরণ।

প্রচার—চৈত্র, ১২৯৫ ।